436740

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাড়াশের স্থাপত্য নিদর্শন

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আয়শা বেগম

প্রফেসর

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

436740

উপস্থাপক

মো: মাসুদ রানা খান

এম.ফিল. গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞান পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, মোঃ মাসুদ রানা খান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসাবে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য আমার তত্ত্বাবধানে "ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাড়াশের স্থাপত্য নিদর্শন" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছে। মৌলিক উপকরণের বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত এ অভিসন্দর্ভটি তার একক গবেষণার ফল। আমি অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

436740

০৮-০৪-২০০৮

ড. আয়শা বেগম

প্রফেসর ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, "ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাড়াশের স্থাপত্য নিদর্শন" শিরোনামের এ গবেষণাকর্মটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে এ বিষয়ের উপর অন্য কেউ অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্য পরিচালিত হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য লিখিত এবং এটি বা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

436740

৪.০৫.০৪

মোঃ মাসুদ রানা খান

এম.ফিল. গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে এম. এ. শেষ বর্ষের ছাত্র থাকাকালে প্রথম তাড়াশের স্থাপত্য নিয়ে আমার আগ্রহ জন্মায়। তখনই পরিকল্পনা করি ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এ বিষয়ে আরো বেশি জানার চেষ্টা করবো। সেই পরিকল্পনারই ফসল "ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাড়াশের স্থাপত্য নিদর্শন" শীর্ষক এই গবেষণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ আমাকে এই গবেষণার সুযোগ দিয়েছে বলে প্রথমেই বিভাগের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই গবেষণাকর্মটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. আয়শা বেগমের সযত্ন দিক নির্দেশনা এবং পরামর্শের কারণেই। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে তার বিশ্লেষণ পর্যন্ত গবেষণার প্রতিটি স্তরেই তিনি আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করেছেন এমনকি প্রয়োজনীয় বই-পত্র কোথায় পেতে পারি তাও জানিয়ে দিয়েছেন। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। স্থাপত্য নিয়ে গবেষণা অত্যন্ত দুরূহ। কেননা শুধু তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন নয়, এর জন্য প্রয়োজন বাস্তব পর্যবেক্ষনমূলক জ্ঞানের। এই জ্ঞান আহরণের জন্য আমাকে যেতে হয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। আর এই দুঃসাধ্য কাজটি সম্পাদনে যে শুভানুরাগীরা আমাকে সহায়তা করেছেন, তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর হাবিবা খাতুন, প্রফেসর পারভীন হাসান, প্রফেসর নাজমা খান মজলিশ, , ড. মো: আখতারুজ্জামান, মো: মোশাররফ

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন ভূইয়া, আব্দুল বাছির, মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, খাদেমুল হক, এস. এম. মফিজুর রহমান ও সুরাইয়া আক্তার বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলাপিডিয়া প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্যসূত্র এবং বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দিয়ে তারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনারের আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার ও এম আর তরফদার স্মৃতি জাদুঘরের সংগ্রহশালা এবং ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে বিশেষ করে কবির আহমেদ ও ছরোয়ার আহমেদ সব সময় এ ব্যাপারে আমাকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা দিয়েছেন। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমী গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর গ্রন্থাগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ (আই বি এস) গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস গ্রন্থাগার থেকেও সহায়তা নিয়েছি।

ব্যক্তিগতভাবে যাদের সহযোগিতা আমার গবেষণার পথকে সুগম করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে প্রফেসর হারাধন গাঙ্গুলী অধ্যক্ষ, শ্রীনগর সরকারি কলেজ, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই এ কে এম মাহবুবুল হক, মহিবুল হোসেন, বাবু আহমেদ, হেলেনা আক্তার, বিপুল চন্দ্র সরকার, বন্ধু মাহমুদা খানম, আমিনুল ইসলাম, মাহফুজুর রহমান, হাসানুজ্জামান, এবং ছোট ভাই মিজান। আমার বন্ধু নাজলী চৌধুরীর প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া এই গবেষণা শেষ করা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না তার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। এই অভিসন্দর্ভ টাইপ করে দিয়েছে রাজু ভাই, সেজন্য তার প্রতিও আমার ঋণ অসামান্য।

Dhaka University Institutional Repository

আরো একজনের কথা হয়তো বলা উচিত ছিলো- আমার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা ছন্দা, নিজের শত ব্যস্ততার মধ্যেও রাতের পর রাত জেগে এই অভিসন্দর্ভের যে কোন বিষয়ে সংশয় হলে সব সময় সহযোগিতা পেয়েছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এমন, তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো যায় না।

মোঃ মাসুদ রানা খান।

এম.ফিল গবেষক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
অভিজ্ঞান পত্র	ii
অঙ্গীকার পত্র	iii
কৃতজ্ঞতার স্বীকার	iv-vi
ভূমিকা	viii-xvi
প্রথম অধ্যায় ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	১-১৮
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মসজিদ ও সমাধি স্থাপত্য	১৯-৩৩
তৃতীয় অধ্যায় ঃ মন্দির স্থাপত্য	৩৪-৪৫
চতুর্থ অধ্যায় ঃ জমিদার বাড়ি ও অন্যান্য নিদর্শন	৪৬-৫৬
পঞ্চম অধ্যায় ঃ উপসংহার	৫৭-৬৮
মানচিত্র	
ভূমি নকশা	
আলোকচিত্র	
পরিশিষ্ট-১. পরিভাষা	
পরিশিষ্ট-২. বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত তাড়াশ অঞ্চলের প্রত্নিদর্শন।	
গ্রন্থপঞ্জি	

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মধ্যযুগীয় উল্লেখযোগ্য নগর-গৌড়, সোনারগাঁ, খলিফাতাবাদ ও বারোবাজার ছাড়াও বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট গুরুত্ববাহী নিদর্শন আজও বিদ্যমান রয়েছে উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল তাড়াশে, যা আমাদের অনেকের কাছে প্রায় অজানা। মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমকালীন স্থাপত্য। কোন একটি অঞ্চলের স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণের রুচিবোধ, তাদের সংস্কৃতির পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি ঐ অঞ্চলের শাসকগোষ্ঠি এবং তাদের প্রশাসনের চরিত্র সম্পর্কেও খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নগরায়ণের ধারা এবং তার সূত্র ধরে প্রশাসনের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি অনুভব করা যায়। আধুনিক ইতিহাস আর রাজাদের কাহিনীই নয়, তখন ইতিহাসকে বিবেচনা করা হয় কালের দর্পণ হিসাবে, যেখানে প্রতিফলিত হয় সমকালের মানব সভ্যতার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। সেখানে রাজাদের রাজ্যপট, যুদ্ধবিগ্রহ, জয় পরাজয়ের চিত্র যেমন থাকে, তেমনি থাকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি, তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের চিত্রও। সেই চিত্র স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে খুব চমৎকার ভাবে ফুটে উঠে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জলবায়ু, নির্মাণ উপকরণের প্রাপ্যতা, জনগণের অর্থনৈতিক সামর্থ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ামকের প্রভাবে গড়ে ঐ অঞ্চলের স্থাপত্যের নিজস্ব চরিত্র এবং তার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের স্থাপত্যের মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সে কারণেই আঞ্চলিক স্থাপত্যের ইতিহাস অন্বেষণ ইতিহাস চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে বাংলাদেশের আঞ্চলিক স্থাপত্যের ইতিহাস চর্চা এখনো তেমন গুরুত্ব পায়নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক স্থাপত্যের ইতিহাস চর্চা তো দূরের কথা এখনো সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বাংলার স্থাপত্য সর্ম্পকেই গবেষণা হয়েছে খুব সামান্য।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকাল হতে সিরাজগঞ্জ একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে খ্যাত। এই জেলার রায়গঞ্জ থানার নিমগাছি হতে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি হতে পাল আমলে "পাহিল" নামে এই অঞ্চলের একজন রাজার নামও পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মুসলিমপূর্ব যুগ হতেই এই অঞ্চলে স্থাপত্য ঐতিহ্য ছিল। মুসলিম শাসনামলেও সিরাজগঞ্জ অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত হত। সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহর সময় হতে সুলতান নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহর সময় পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও নৌঘাঁটি ছিল তার প্রমাণ শিলালিপিতে রয়েছে। শুধু মসজিদ নয় এই অঞ্চল মন্দির স্থাপত্যেও বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

সিরাজগঞ্জ জেলার তথ্য সম্বলিত গ্রন্থের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ১৮৯৫ সালে বৃটিশদের দ্বারা সর্বপ্রথম বাংলার কিছু স্থাপত্য নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে তালিকাভূক্ত করা হয়। এই প্রতিবেদনটি ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। এতে জেলা ভিত্তিক প্রত্নইমারত ও ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা তালিকাভূক্ত করা হয়। ১৮৯৫ সালের এই জরিপ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই অঞ্চলে কোন প্রত্নইমারত নেই। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত ওমাইলীর *'বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ারস সিরিজ'* এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে সেই স্থানের দু-একটি ঐতিহাসিক স্থাপত্যের উল্লেখ খুব সংক্ষেপে করা হয়।

১৯৩৪ সালে *'পাবনা জেলার ইতিহাস'* প্রণেতা রাধা রমন সাহা তার গ্রন্থে বৃহত্তর পাবনা জেলার স্থাপত্য সর্ম্পকে বেশ কিছু ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু সে ধারণাগুলো বিজ্ঞান সম্মত নয়। আহমদ হাসান দানিকে এক্ষেত্রে পথিকৃৎ বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Muslim Architecture in Bengal* এ সর্ব প্রথম মধ্যযুগের মুসলিম শাসন আমলে বাংলা অঞ্চলের স্থাপত্যিক কীর্তিসমূহের একটি ধারাবাহিক এবং সুসংবদ্ধ ইতিহাস রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে তিনি এয়োদশ শতকের গোড়ায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতকের শেষে বাংলার নবাবী যুগের অবসান পর্যন্ত সময়ের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য সমূহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ যোগ হওয়ায় এই গ্রন্থ থেকে বাংলার স্থাপত্যের সামগ্রিক চরিত্র সর্ম্পকে ধারণা পাওয়া সম্ভব হলেও এই অঞ্চলের মাত্র দুটি ইমারত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৬৭ সালে রচিত হয় *চলন বিলের ইতিকথা* এম.এ. হামিদ রচিত এই গ্রন্থে পাবনার চলন বিল অঞ্চলের স্থাপত্য নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় ডেভিড *ম্যাককাচিয়নের লেট মিডাইভাল টেম্পলস অব বেঙ্গল* এই বইয়ে ম্যাককাচিয়ন বাংলার মন্দির সমূহের বর্ণনা, তালিকাভূক্ত ও শ্রেণিকরণ করেছেন। এই বইয়ে তাড়াশের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্দির স্থাপত্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। আ.কা. ম. যাকারিয়ার *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* বইটি ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ে তাড়াশের কিছু প্রত্নস্থলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। ১৯৮৬ সালে চৌধুরী মহাম্মদ বদরুদ্দোজা *জিলা পাবনার ইতিহাস* রচনা করেন। এতে পাবনা জেলার কিছু ইমারতের বর্ণনা থাকলেও তাড়াশের স্থাপত্য সর্ম্পকে তেমন কোনো উল্লেখ নেই।

তাড়াশ সিরাজগঞ্জ জেলার ছোট একটি উপজেলা। কিন্তু এই ক্ষুদ্র অঞ্চলে সেই প্রাচীনকাল থেকে ঔপনিবেশিক আমল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য ও শিলালিপির প্রাপ্তি এই অঞ্চলের গুরুত্বকে প্রমাণ করে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চল নিয়ে ইতিপূর্বে তেমন কোন কাজই হয়নি। এমনকি এখানকার অনেক ইমারত সম্বন্ধে পন্ডিতদের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণাও রয়ে গেছে। এলাকাটি দূর্গম বলে এই অঞ্চলে সরেজমিনে জরিপ করে গবেষণামূলক কাজের কোন উদাহরণ নেই। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক একটি জরিপ পরিচালিত হয় যা ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। উক্ত জরিপ শুধু বর্ণনামূলক তথ্য প্রকাশ করে। এছাড়া ২০০২ সালে প্রকাশিত প্রফেসর ড. আয়শা বেগম এর *পাবনার ঐতিহাসিক*

Dhaka University Institutional Repository

ইমারত নামে গ্রন্থটিতে বৃহত্তর পাবনার স্থাপত্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে বলে তাড়াশ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করার সুযোগ ছিল না। এই অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্যের সংগ্রাম তাদের প্রশাসন ব্যবস্থার চরিত্র এবং সে সঙ্গে এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের বিকাশের ইতিহাসের মূল্যবান সূত্র হিসাবে এখনো দাঁড়িয়ে আছে সুলতানি, মুঘল ও ঔপনিবেশিক আমলের স্থাপত্য কীর্তিগুলো। কালের প্রবাহে এর অনেকগুলোই এখন ধ্বংসোন্মুখ। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেগুলো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে এখনো, সেগুলোরও বেশির ভাগই অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণের শিকার হয়ে ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছে স্বকীয়তা। সেই সঙ্গে মুছে যাচ্ছে ইতিহাসের অমূল্য সূত্রও। এই প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলটি নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা হওয়া জরুরী যা বাংলার স্থাপত্য তথা রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাকর্মটি দুটি পদ্ধতিতে সম্পাদিত হবে।

১. ঐতিহাসিক তথ্য

২. বাস্তব জরিপ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে

১. ঐতিহাসিক তথ্য:

গবেষণার এই পর্যায়ে প্রথমে বিভিন্ন গ্রন্থ, আজ পর্যন্ত প্রকাশিত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেদনসহ অন্যান্য প্রতিবেদন, গেজেটিয়ারস, স্মরণিকা, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন দলিলের মধ্যে উল্লিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরপর সংগৃহিত তথ্যকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুধু যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত তথ্যই গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অথচ দুস্প্রাপ্য তথ্যের জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত দলিল-দস্তবেজের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দুস্প্রাপ্যতা হেতু পরবর্তীকালে প্রকাশিত গ্রন্থ হতে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

২. বাস্তব জরিপ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে:

গবেষণার এই পর্যায়ে অভিসন্দর্ভে সন্নিবেশিত সকল প্রত্নস্থলে গিয়ে সরেজমিনে স্থাপত্যের অবস্থান, মাপ, চিত্র, বিভিন্ন কিংবদন্তি ইত্যাদি তথ্য সংকলিত করে বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য স্থানীয় জনগণের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করা হয়েছে। জরিপে সংগৃহিত মাপ ও পূর্ব- প্রকাশিত মাপের মধ্যে তুলনা করে যৌক্তিক মাপটি গ্রহণ করা হয়েছে। শিলালিপিগুলোর ক্ষেত্রে পূর্ব-প্রকাশিত শিলালিপির বিশুদ্ধ পাঠটি গ্রহণ করা হয়েছে। স্থাপত্যের ভূমি নকশার ক্ষেত্রে পূর্ব প্রকাশিত নির্ভরযোগ্য মাপ যৌক্তিকতার বিচারে গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিভাজন

ভূমিকা : গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও এই অঞ্চল সম্বন্ধে পূর্ববর্তী প্রকাশনা সম্বন্ধে আলোচনা এবং গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হবে।

প্রথম অধ্যায় :

ঐতিহাসিক পটভূমি এই অধ্যায়ে তাড়াশ অঞ্চলের ইতিহাসকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:তাড়াশ অঞ্চলের মসজিদ ও সমাধিস্থাপত্য নিদর্শন তৃতীয় অধ্যায়: তাড়াশের মন্দির স্থাপত্য নিদর্শন চতুর্থ অধ্যায়: তাড়াশের জমিদার বাড়ি ও অন্যান্য নিদর্শন।

উপরোক্ত তিনটি ভাগে তাড়াশের ধর্মীয় ও ঐহিক স্থাপত্য গুলোর সঠিক বর্ণনা, ভূমি নকশা, শিলালিপির পাঠ সহ তুলনামূলক একটি আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়:

উপসংহার : উপর্যুক্ত বর্ণনামূলক অধ্যায়গুলির প্রেক্ষিতে তাড়াশের স্থাপত্যিক পর্যালোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র, ভূমি নকশা ও আলোক চিত্রের তালিকা

ক. মানচিত্র

১. বাংলাদেশ

২. সিরাজগঞ্জ

৩. তাড়াশ থানা

৪. তাড়াশের স্থাপত্য নিদর্শন।

খ. ভূমি নকশা

১. নবগ্রাম তাগনের মসজিদ

২. নবগ্রাম শাহী মসজিদ

৩. গদাই সরকার মসজিদ

৪. ইসলামপুর জামে মসজিদ

৫. সান্দুরিয়া জামে মসজিদ

৬. তাড়াশ শিব মন্দির দক্ষিণমুখী (কপিলেশ্বর মন্দির)

৭. তাড়াশ শিব মন্দির পশ্চিমমুখী।

৮. রশিক রায়ের মন্দির

৯. তাড়াশ গোবিন্দ মন্দির (নাটমন্দির)

১০. ছোট শিব মন্দির (জগন্নাথ মন্দির)

১১. বৃন্দাবন বিহারী মন্দির

১২. বারুহাস ইমামবাড়া-১

১৩. বারুহাস ইমামবাড়া-২

গ. আলোকচিত্র (রঙিন ও সাদা কালো)

১. পাহিল এর শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

২. মাধাই নগর তাম্রশাসন।

৩. মাধাই নগর তাম্রশাসন।

৪. নবগ্রাম ভাগনের মসজিদের শিলালিপি

৫. নবগ্রাম ভাগনের মসজিদের মিহরাব

৬. নবগ্রাম ভাগনের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ

৭. নবগ্রাম ভাগনের মসজিদের অলংকৃত প্রস্তর স্তম্ভ

৮. নবগ্রাম শাহী মসজিদের শিলালিপি

৯. নবগ্রাম শাহী মসজিদ, চার গম্বুজ বিশিষ্ট

১০. নবগ্রাম শাহী মসজিদের পিছনের অংশ

১১. নবগ্রাম শাহী মসজিদের সম্মুখ বারান্দায় কষ্টি পাথরের স্তম্ভ

১২. বারুহাস মসজিদ

১৩. গদাই সরকারের মসজিদ

১৪. ইসলামপুর জামে মসজিদ

১৫. সান্দুরিয়া জামে মসজিদ

১৬. হযরত শাহ্ শরীফ জিন্দানীর মাজার

১৭. তাড়াশ শিব মন্দিরের প্রবেশ পথ (দক্ষিণমূখী)

১৮. তাড়াশ শিব মন্দিরের অলংকৃত সম্মুখ ফাসাদ (দক্ষিণমুখী)

১৯. তাড়াশ শিব মন্দিরের শিলালিপি (দক্ষিনমুখী)

২০. তাড়াশ শিব মন্দির (পশ্চিমমুখী)

২১. রসিক রায়ের মন্দির

২২. রসিক রায়ের মন্দিরের দোচালা প্রবেশপথ।

২৩. তাড়াশ গোবিন্দ মন্দির

২৪. ছোট শিব মন্দির (জগন্নাথ)

Dhaka University Institutional Repository

২৫. ছোট শিব মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত শিব লিঙ্গ

২৬. বৃন্দাবন বিহারী মন্দির

২৭. গোপাল বাড়ি মন্দির

২৮. কাঁটার বাড়ি মন্দির (পুনর্নির্মিত)

২৯. নওগাঁ শিবমন্দির

৩০. বেহুলার কূপ

৩১. বেহুলার ভিটা

৩২. বারুহাস ইমামবাড়া-১

৩৩. বারুহাস ইমামবাড়া-২

৩৪. বস্তুল শিববাড়ি

৩৫. বিবির বাংলা (পুনর্নির্মিত)

৩৬. তাড়াশ রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ

৩৭. রংমহল

৩৮. ভান সিংহের দীঘি

৩৯. নওগাঁ শিব লিঙ্গ

৪০. রাণীর জাঙ্গালের সেতু

৪১. রাণীর জাঙ্গালের সেতুর শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

চলনবিল অঞ্চলে তাড়াশ একটি প্রাচীন জনপদ। এর উত্তরে বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলা, পূর্বে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়া উপজেলা, দক্ষিণে পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া ও চাটমোহর উপজেলা এবং পশ্চিমে নাটোর জেলার গুরুদাসপুর ও সিংড়া উপজেলা অবস্থিত। ১৯১৬ সালের পূর্বে তাড়াশ রায়গঞ্জ থানার অংশ ছিল। ১৯১৬ সালে তাড়াশ থানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং ১৯১৬ সালের ২ জুন তাড়াশ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালের ৩০ জানুয়ারী সিরাজগঞ্জ মহাকুমাকে জেলায় রূপান্তরিত করার পর তাড়াশ সিরাজগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলাটি যে একটি প্রাচীন জনপদ তার প্রমাণ মেলে এই স্থানে প্রাপ্ত প্রত্নিদর্শন ও এর ভৌগলিক অবস্থান লক্ষ করলে। তাড়াশের পূর্বে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলা, যার প্রাচীনত্ব অন্তত অষ্টম শতকের পূর্বে বলে লিখিত উৎস থেকে জানা যায়। রায়গঞ্জ থানার নিমগাছি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। এই স্থান হতে প্রাপ্ত পাহিলের শিলালিপি (চিত্র-১) হতে প্রাচীন বাংলার তিনজন মন্ডলাধিপতির নাম পাওয়া যায় তারা হলেন শিবরুদ্র, কর্করাজ ও পাহিলা। কনৌজ রাজ যশোবর্মনের সাথে ভট্টাল দেশের কর্করাজের মিত্রতা ছিল বলে জানা যায়।[১] কর্করাজ যে অঞ্চলের শাসক ছিলেন তার নাম ছিল ভট্টাল মন্ডল যা পুন্ড্রবর্ধনভূক্তির অন্তর্গত ছিল। এটি ছিল মন্ডল নামক একটি প্রশাসনিক ইউনিট এবং প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় তাড়াশ অঞ্চলটিও এ সময় এই ভট্টাল মন্ডলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। লিপিতে উল্লিখিত শিবরুদ্র ছিলেন কর্করাজের পুত্র। তাঁর পুত্র পাহিল ছিলেন দেবপালের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী। সম্ভবতঃ তিনি পাল

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনের কোন পদে সমাসীন ছিলেন বলে লিপি পাঠে প্রতিয়মান হয়। নিমগাছি লিপি থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্ত তথ্য হল এরা সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারি।

যশোবর্মনের সভা কবি বাকপতি রচিত 'গৌড়বাহ' হতে জানা যায় যশোবর্মন গৌর মগধাধিপতিকে পরাজিত করে পূর্বদিকে অগ্রসর হন ও বঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। ডি.সি. সরকার এর মতানুসারে এই এলাকা সেই সময়ও পুন্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু এর অবস্থান ছিল একেবারে বঙ্গের সীমান্তে। গৌরেশ্বর ভট্টাচার্যের মতে এই কর্করাজ নিশ্চিতভাবে কনৌজ রাজ যশোবর্মনের কোন অধস্তন কর্মচারী হয়ে থাকবেন। সম্ভবতঃ তিনি অষ্টম শতকের প্রথমার্ধেই জীবিত ছিলেন। [২]

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাল বংশের প্রতিষ্ঠা বাংলা রাজনৈতিক ও স্থাপত্য ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাল বংশের প্রায় ১৭ জন রাজা শাসন করেন তাদের মধ্যে ধর্মপাল, দেবপাল, মহেন্দ্রপাল ও শূর পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মপালের শাসনামলে নওগাঁর পাহাড়পুর অঞ্চলে সোমপুর নামে যে বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয় এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বাংলাসহ পরবর্তী স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানকার প্রাচীন কীর্তিরাজি, প্রাচীন জলাশয় ও প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী এলাকার পাল ও পাল পূর্বযুগের সমৃদ্ধ স্থাপনার সত্যতা প্রমাণ করে।

একাদশ শতকের শেষের দিকে কৈবর্তগণ পাল সম্রাট ২য় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্রী দখল করে নেয়।[৩] কৈবর্ত শাসক ভীম কর্তৃক এ সময় চলনবিলের উত্তর সীমান্তে ও সিরাজগঞ্জ থেকে শেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মৃত্তিকা প্রাকার নির্মাণ করেন যা এখনও ভীমের জাঙ্গাল নামে পরিচিত।[৪] ত্যানডান ব্রুকের মানচিত্রে পাবনা জেলার হান্ডিয়াল ও

Dhaka University Institutional Repository

তাড়াশের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে বগুড়ার শেরপুর পর্যন্ত আরও উত্তরে বিস্তৃত রাস্তাকেই ভীমের জাঙ্গাল হিসাবে দেখানো হয়েছে।

একাদশ-দ্বাদশ শতকে পাল রাজাদের পরাজিত করে সেন রাজাগণ বাংলা দখল করেন। বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার মাধাইনগর হতে লক্ষণ সেনের শাসনামলের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে (চিত্র-২, ৩)। এটি লক্ষণ সেনের রাজত্বকালের ২৫তম বছরে উৎকীর্ণ (১১৭৮+২৫= ১২০৩)। এই তাম্রফলকে শ্রী নারায়ণ ভট্টারককে দাপনিয়া পট্টক নামে একটি গ্রাম দানের উল্লেখ রয়েছে। [৫]

সেন রাজত্বের শেষভাগে সেন রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সময় (১২০৪ সাল) ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজীর নেতৃত্ব মুসলমানগণ লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া দখল করে নেয়। লক্ষণসেন পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান এবং লক্ষণাবর্তী বখতিয়ারের হস্তগত হয় (৬০২ হি. বা ১২০৪ খ্রি.)।[৬] এই বিজয়ের ফলে সালে সম্ভবত তাড়াশসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে। বখতিয়ার খলজীর শাসনামলে মুসলিম বাংলার রাজধানী ছিল দেবকোটে। তিব্বত অভিযানে ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর বখতিয়ার দেবকোটেই ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর সময় মুসলিম বিজিত রাজ্যে বহু মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭] তবে তাঁর আমলে নির্মিত কোন স্থাপত্য নিদর্শন বর্তমানে আর টিকে নাই। বখতিয়ারের মৃত্যুর পর মুহম্মদ শিরান খলজী শাসন ক্ষমতায় বসেন (১২০৬ খ্রি.) কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই শীরান খলজী অপসারিত হন ও হুসাম-উদ-দীন ইওজ খলজী দেবকোটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইওজ খলজী ২ বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। এরপর বখতিয়ার খলজীর জনৈক আমির ও তার হত্যাকারী আলী মর্দান খলজী আলাউদ্দিন খলজী উপাধি ধারণ করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন। ১২১২ খ্রিস্টাব্দে আলী মর্দান খলজী হুসাম উদ্দিন ইওজ খলজীর নেতৃত্বে

Dhaka University Institutional Repository

আমীরদের দ্বারা নিহত হন। হুসাম উদ্দিন গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজী উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে বসেন। তিনি প্রায় চৌদ্দ বছর রাজ্য শাসন করেন। বাংলার মুসলমান শাসকের মধ্যে ইওজ খলজীই সর্ব প্রথম যার মুদ্রা অধিক পরিমাণে আবিস্কৃত হয়েছে। তিনি রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন এবং স্বীয় মুদ্রায় আব্বাসীয় খলিফার নামও অঙ্কন করেন। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে ইলতুতমিশের পুত্র নাসির উদ্দিনের নিকট তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মিনহাজ ৬৪১ হিজরীতে লাখনৌতি রাজ্যে আগমন করলে ইওজ খলজী বহু ইবাদতখানা ও মসজিদ নির্মান করেন। তাঁর নির্মিত সুকার্যের নিদর্শন রাজ্যের সর্বত্র দেখতে পান। বর্তমানে এই সকল ইমারতের কোন কিছুই টিকে নেই। বীরভূম জেলার সিয়ামে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি হতে ১২২১ খ্রিস্টাব্দে ঐ অঞ্চলে একটি খানকা নির্মাণের কথা জানা যায়। [৮] আবিস্কৃত শিলালিপির মধ্যে এটাই বাংলার মুসলমান শাসকদের প্রাপ্ত প্রথম শিলালিপি।

গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজীর মৃত্যুর পর বাংলার শাসন দিল্লী সালতানাতের অধীন হয়ে পরে। তবে ১২২৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট যে ১৬জন শাসনকর্তা লক্ষণাবর্তী শাসন করেন তাদের কেউই দিল্লীর সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন নি বরং এদের কেউ কেউ নিজেদের স্বাধীন সুলতান হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। সুলতান মুগীজ উদ্দিন তুঘরিল তাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি। তুঘরিল ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের নিকট পরাজিত হন। এরপর বলবনের পুত্র বুগরা খান লাখনৌতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু বুগরা খানও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ উপাধি ধারণ করেন। বুগরা খান পরবর্তীতে ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখেন এবং ঐ বছর সুলতান গিয়াস উদ্দিন তুঘলক লাখনৌতি তার সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন।

Dhaka University Institutional Repository

দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিকে হাজী ইলিয়াস শাহ নামের জনৈক ব্যক্তি ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে লাখনৌতির সিংহাসন দখল করেন এবং সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করে স্বাধীন বাংলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলা স্বীয় অধিকারভুক্ত রাখার জন্য যে সমস্ত হিন্দু জমিদারদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে ভাদুরী ও সান্যালগণ ছিলেন প্রধান। তাই প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের শাসনামলে এ অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-৮৯ খ্রি.), গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.), সাইফুদ্দীন হামযা শাহ (১৪০৯-১৪১০ খ্রি.), শিহাব উদ্দিন বায়জিদ শাহ (১৪১২-১৪১৪ খ্রি.) ও আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে এ জেলার উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন। ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটিয়ে ভাতুরিয়া পরগণার রাজা গণেশ বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করেন।[৯] মেজর রেনেলের মানচিত্রে পাবনার অধিকাংশ স্থান ভাতুরিয়ার অন্তর্গত দেখানো হয়েছে। পাবনা জেলার চাটমোহরের কতকাংশ এখনও ভাতুরিয়া নামে পরিচিত। রাজা গণেশের উত্থানের ফলে বাংলার মুসলিম শাসনের মধ্যে একটি ছেদ সৃষ্টি হয় এবং স্বল্প সময়ের জন্য হলেও বাংলায় হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তার পুত্র যদু (১৪১৮ খ্রি. ৮২১ হি.) যিনি গণেশের জীবিত অবস্থায়ও একবার সিংহাসনে বসেছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করে সিংহাসনে পুনরারোহন করেন। ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চলসহ সমগ্র বাংলার উপর তাঁর শাসন ক্ষমতা অব্যাহত থাকে। জালাল উদ্দিনের মৃত্যুর পর তার পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ শাহ (১৪৩২-১৪৪২ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহন করেন।

১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহের একজন বংশধর শামসুদ্দীন আহমদ শাহকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন দখল করেন এবং আবুল মুজাফফর নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম

Dhaka University Institutional Repository

ধারণ করেন। সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার নবগ্রাম হতে নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহর শাসনামলের একটি শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে। উক্ত লিপিতে সিমলাবাদ নামে একটি 'খিত্তা' বা সুরক্ষিত শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের সময় থেকে হুসেন শাহী সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের সময় পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে মুসলিম শাসকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থায় এ অঞ্চল প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র (সিমলাবাদ) হিসেবে বিবেচিত হত। [১০] নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহর মৃত্যুর পর যথাক্রমে রুকুনুদ্দীন বরবক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) ও জালাল উদ্দিন ফতে শাহ (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রি.) বাংলা শাসন করেন।

১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসন ক্ষমতা আবিসিনীয় ক্রীতদাসদের হাতে চলে যায়। আবিসিনিয় শেষ শাসক মুজাফফর শাহকে হত্যা করে তাঁর উজির আলাউদ্দিন হুসেন শাহ উপাধি ধারণ করে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে লাখনৌতির সিংহাসনে আরোহন করে হুসেন শাহী রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আবিসিনীয় শাসকদের শাসনামলে বাংলায় যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল আলাউদ্দিন হুসেন শাহ তার অবসান ঘটান এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এ সময় দেশে রাজনৈতিক সম্প্রীতি, বিস্তৃতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ঘটে। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ১৫৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার নবগ্রাম হতে নুসরত শাহর সময়কালের একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে যেখানে জঙ্গদার ও মীর-ই-বহর ইত্যাদি উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের নাম পাওয়া যায় যা থেকে মনে করা যেতে পারে যে, নুসরত শাহর সময় পাবনা অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি ছিল এবং এটি একটি নৌঘাঁটি হিসাবেও সুলতানী আমলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।[১১] পাবনা অঞ্চলে মসজিদে প্রাপ্ত শিলালিপির মধ্যে নবগ্রাম ভাগনের মসজিদের

Dhaka University Institutional Repository

শিলালিপিটি সর্বপ্রাচীন। নবগ্রামে একই স্থানে দুটি উল্লেখযোগ্য মসজিদের অবস্থান নিঃসন্দেহে এখানকার গুরুত্ব প্রমাণ করে। সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়ে নবগ্রাম (নওগাঁ) সম্ভবত মাহমুদাবাদের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং পাবনার দক্ষিণে বিস্তৃত এলাকা মাহমুদাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করায় প্রতীয়মান হয় যে, পাবনার দক্ষিণে এবং সরকার বাজুহার অর্ন্তগত ইউসুফ শাহী পরগণাটি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে মাহমুদাবাদ প্রশাসনিক অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত ছিল।[১২]

নুসরত শাহর মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ উত্তরাধিকারী হন। এরপর বিহারের আফগান নেতা ও পরবর্তী দিল্লীর সুলতান শের শাহ শুরী (১৫৩৯-১৫৪৫ খ্রি.) কর্তৃক বাংলা বিজয়ের ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ শাহর রাজত্বের অবসান ঘটে। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে শের শাহর মৃত্যুর পর তার পুত্র ইসলাম শাহ (১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রি.) এ জেলার উপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। ইসলাম শাহর মৃত্যুর পর বাংলার শাসনকর্তা শুর বংশীয় মাহমুদ খান শুর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং শামুসদ্দিন মুহম্মদ শাহ গাজী (১৫৫৩-১৫৫ খ্রি.) উপাধি ধারণ করেন। মুহম্মদ শাহ দিল্লীর সুলতান আদিল শাহর নিকট ১৫৫৫ খ্রি. পরাজিত হন এবং আদিল শাহর প্রতিনিধি শাহবাজ খাঁ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তিনি মুহম্মদ শাহর পুত্র খিজির খার নিকট পরাজিত হন। তিনি গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ নাম ধারন করে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে কররানী বংশীয় আফগান তাজখান কররানী তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহকে পরাজিত করে বাংলায় কররানী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাজখানের মৃত্যুর পর তার ভাই সুলাইমান কররানী বাংলায় কররানী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাজখানের মৃত্যুর পর তার ভাই সুলাইমান কররানী বাংলার ক্ষমতায় আসেন। সুলাইমান বাংলা বিহারের সার্বভৌম নৃপতি হওয়া সত্ত্বেও সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন নাই। হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুমায়ুনের নিকট উপহার সামগ্রী পাঠান। সমসাময়িক

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিকদের মতে সোলায়মান কররানী আকবরের নামে খুতবা পাঠ করতেন এবং মুদ্রা জারি করেন। [১৩] সোলায়মান কররানীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদ্বয় বায়জিদ ও দায়ুদ নিজেদের নামে খুতবা পাঠ করান।[১৪] দায়ুদ খান কররানীর সময় বাংলা বিহারে বিশৃঙ্খলার সুযোগে মুঘল সেনাপতি মুনিম খান ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করে কররানীদের রাজধানী তান্ডা দখল করে নেন এবং বাংলায় মুঘল কর্তৃত্বের সূচনা ঘটে। কিন্তু আফগান শক্তির পতন হলেও আফগান সেনানায়ক এবং বাংলার ভূঞা জমিদার ও সামন্ত প্রধানরা মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

ইসলাম খান চিশতী ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬০৫ সালে আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত মোট নয়জন সুবাদার বাংলা শাসন করেন এবং মুঘল অধিকৃত এলাকা পশ্চিমে রাজমহল, পূর্বে বগুড়ার শেরপুর মুর্চা, উত্তরে ঘোড়াঘাট, দক্ষিণে সাতগাঁও এবং বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[১৫] ইসলাম খানের পূর্বে কুতুব-উদ-দীন খান কোকা ও জাহাঙ্গীর কুলী খান (১৬০৬-১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার সুবাদার হিসাবে নিযুক্ত থাকলেও বাংলায় মুঘল সম্প্রসারণে অবদান রাখতে পারেন নাই। ইসলাম খান বাংলার তৎকালীন রাজধানী রাজমহলে পৌছেই বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি বীরভূম, পাচেট ও হিজলীর জমিদারদের আনুগত্য আদায় করেন। এরপর তিনি ভূষণার জমিদার সত্রাজিতকে পরাজিত করেন। এ সময় মুঘল বাহিনীর সঙ্গে সোনাবাজু; ভাতুরিয়া বাজু, ইউসুফশাহী ও চাঁদ প্রতাপের জমিদারের সংঘর্ষ হয়। ইতিপূর্বে সোনা বাজু ও ভাতুরিয়া বাজু মুঘল মীর-ই-বহর ইতিমাম খানকে জায়গীর হিসাবে প্রদান করা হয়েছিল। সোনাবাজুর এক সময়ের প্রভাবশালী জমিদার মাসুম খান কাবুলীর পুত্র মিরযা মোমীন, খান আযম বাবুদীর পুত্র দরিয়া খান ও খালসির জমিদার মাধব রায় সম্মিলিতভাবে ইতিমাম খানের প্রতিনিধিদের বিতাড়িত করে এই অঞ্চলসমূহের উপর

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃত্ব স্থাপন করলে ইতিমাম খান এই সমস্ত জমিদারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং শত্রু পক্ষ সোনারগাঁয়ের মুসা খানের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এভাবে দ্বাদশ মুঘল সুবাদার ইসলাম খানের শাসনামলে সমগ্র পাবনা অঞ্চল মুঘল কর্তৃত্বাধীনে এসে যায়। ইসলাম খান ১৬১০/১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভাটি অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র বাংলা মুঘল শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। সুবা বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করে মুঘল শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। নতুন রাজধানীর নাম হয় জাহাঙ্গীরনগর। বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ইসলাম খানের পর থেকে মুর্শিদকুলী খানের সময় পর্যন্ত মোট ১৪জন সুবাদার মুঘলদের পক্ষে বাংলা শাসন করেন। এই সময়কালে মুঘল শাসনাধীনে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তেমন কোন পরিবর্তনের বিবরণ পাওয়া যায় না।

মুর্শিদকুলী খান ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার শেষ মুঘল সুবাদার। তিনি ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত হলেও ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হিসাবে মৃত্যুবরণ করেন। মুর্শিদকুলী খানের শাসনামলে বাংলায় তিনটি শক্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরা হলেন ঃ- (১) জমিদার শ্রেণী (২) অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান (৩) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এই শক্তিগুলো প্রথমে ভূমি ও ব্যবসা বাণিজ্যে তৎপর হয় এবং পরে বাংলার রাজনীতিতে অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। [১৬]

মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাঁর প্রণীত রাজস্ব নীতির ফলে বেশ কিছু নতুন জমিদারির সৃষ্টি হয়। এই সকল নতুন জমিদারির মধ্যে একটি ছিল নাটোর জমিদারি। মুর্শিদকুলী খানের প্রশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল হিন্দু কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি। তাঁর রাজস্ব সংগ্রহ কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

রঘুনন্দন। রঘুনন্দন টাকশালের দারোগাও ছিলেন এবং প্রশাসনে এমন ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন যে, তাঁর প্রচেষ্টায় তার ভাই রামজীবন দেবীনগর, বনগাছি, ভাতুরিয়া, সুলতানপুর, স্বরূপপুর ও ভূষণার জমিদারি লাভ করে নাটোর জমিদারির জন্ম দেয়। বৃহত্তর পাবনা জেলা এই ভাবেই নাটোর জমিদারিভুক্ত হয়। নাটোর জমিদারি অষ্টাদশ শতকে বাংলার অন্যতম প্রধান জমিদারিতে পরিণত হয়।

এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সপ্তদশ শতকের শেষ দিক হতেই তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকে। তারা সুবাদার আজিম উদ্দিনকে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এই তিনটি গ্রাম ক্রয়ের অধিকার লাভ করেন। তবে মুর্শিদকুলী খানের সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কার্যক্রম নবাবের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই ছিল। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর সুবাদারের নিযুক্তি উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পরবর্তী সুবাদারগণ সকলেই বাহুবলে ক্ষমতা দখল করেন এবং পরে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লাভ করেন। এই কারণে অষ্টাদশ শতকে বাংলায় মুঘল শাসনের ইতিহাস নিজামত বা নবাবি আমল নামে পরিচিত।[১৭]

১৭২৭ থেকে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই অঞ্চল তৎকালীন বাংলায় নবাব সুজাউদ্দিন এবং ১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নবাব আলীবর্দী খানের অধীনে শাসিত হয়। এসময় নাটোর জমিদারি প্রথমে রামজীবন ও পরে তাঁর স্ত্রী রানী ভবানীর অধীনে পরিচালিত হত। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি এক বছর শাসন ক্ষমতায় ছিলেন।

শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই নবাবকে অভিজাত বর্গের ষড়যন্ত্রের স্বীকার হতে হয়। এই ষড়যন্ত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও অভিজাতদের সাথে যোগ দেন। অবশেষে ইংরেজদের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে বিরোধের সূত্র ধরে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ বাহিনীর নিকট পরাজিত হন। এতে করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাবের উপর প্রভূত ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ পায়। তারা চুক্তি মোতাবেক মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসায়। কিন্তু মীরজাফর তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট অর্থ কোম্পানীকে দিতে না পারায় নবাবি হারান এবং মীর কাসিমককে বাংলার নবাবের আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। মীর কাসিম ইংরেজদের প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করে নিজ সেনাবাহিনী পুনর্গঠন ও রাজধানী স্থানান্তরের মাধ্যমে ইংরেজ বলয় হতে বাংলাকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু মীর কাসিমের গৃহিত ব্যবস্থা ইংরেজ স্বার্থে আঘাত হানায় বাংলার নবাবের সাথে পুনরায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সংঘাত সৃষ্টি হয়। ১৭৬৪ সালে সংঘটিত বক্সারের যুদ্ধে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব মীর কাসিমের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

১৭৬৫ সালে এলাহাবাদ চুক্তির মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট হতে বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে নায়েব ও মুঘল সম্রাটের পক্ষ থেকে নাজিম নিযুক্ত হন। এ সময় আপাতদৃষ্টিতে দেশ নবাবী আমলের মত স্বাধীন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল মুঘল প্রশাসনের ছদ্মাবরণে ঔপনিবেশিক শাসন। এদিকে রেজা খানের দুর্বল শাসন ও কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ ব্যবসায় রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও অত্যাচার নির্যাতনে ১৭৬৯-৭০ এ দেখা দেয় এক মহাদুর্ভিক্ষ। ১৭৬৯ এর দুর্ভিক্ষ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ধার্যকৃত অতিরিক্ত করের চাপ ও খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এ সময় বাংলার রাজনীতিতে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী এক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ইতিহাসে এটা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বলে পরিচিত। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন রেনেলের বিবরণ থেকে সিরাজগঞ্জ জেলায় ফকির সন্ন্যাসীদের তৎপরতা সম্বন্ধে জানা

Dhaka University Institutional Repository

যায়। এ সময় এই এলাকায় ফকিররা খুবই তৎপর ছিল। এসব ফকিরদের দমনের জন্য মুর্শিদাবাদ হতে লেফটেন্যান্ট টেলারের নেতৃত্বে দুটি সিপাহীদল প্রেরণ করা হয়। মজনু শাহ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ জেলা ও তার আশেপাশের জেলা সমূহে তৎপর ছিলেন।[১৮]

দেশের এই অস্থিতিশীল অবস্থার জন্য দায়ী করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে রেজা শাহকে বরখাস্ত করে এবং কোম্পানী সরাসরি নিজের হাতে দেওয়ানী পরিচালনার ভার নেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি প্রশাসনকে ইউরোপীয়করণের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ করেন। প্রতি জেলায় একজন কালেক্টর ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। রাজস্ব বিভাগ পরিচালনার জন্য বোর্ড অব রেভিনিউ গঠন করা হয় যেখানে নিম্নবেতনভোগী কতিপয় মুনশী-মুজরার ছাড়া সকল পদেই শ্বেতাঙ্গদের নিয়োগ দেওয়া হয়। হেস্টিংস বাংলার বিপর্যস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত করেন। এতে নিলামে সর্বোচ্চ খাজনা প্রদানকারীকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। হেস্টিংসের পাঁচশালা বন্দোবস্তের ফলে অনেক পুরাতন জমিদার তাদের জমিদারি থেকে বঞ্চিত হন। বহু অসৎ ও অর্থলোভী দালাল সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানের শর্তে বন্দোবস্ত নেয় এবং অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে তারা অমানুষিক অত্যাচার শুরু করেন। এভাবে হেস্টিংসের পাঁচশালা বন্দোবস্ত দেশের অত্যাচার উৎপীড়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১৭৮৬ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় ইউরোপীয় জেলা কালেক্টরকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। জেলা কালেক্টর হলেন একাধারে জেলার রাজস্ব, বিচার ও পুলিশ কর্তৃপক্ষ। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিশ দশশালা বন্দোবস্ত চালু করেন। জমিদারের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিধিবিধানগুলির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক দিক ছিল রাজস্ব বিক্রয় আইন,

Dhaka University Institutional Repository

যাকে তারা মোলায়েম ভাষায় বলতেন সূর্যাস্ত আইন। এই আইনের শর্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বারোটি কিস্তিতে জেলা কালেক্টরেটে পরিশোধ করতে হতো। কোন জমিদারের প্রদেয় কিস্তি বকেয়া পড়লে পরবর্তী মাসে ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ঐ জমিদারের জমি থেকে বকেয়া কিস্তির সমমূল্যের জমি বিক্রয় করে সেই টাকা উসুল করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর হওয়ার একেবারে শুরু থেকে রাজস্ব বিক্রয় আইনের (সাধারণ্যে সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত) অধীনে শত শত জমিদারি সম্পত্তি বিক্রয় হয়ে যায়। সেকালের লোকেরা এই আইনকে সূর্যাস্ত আইন বলত এই অর্থে যে এর ফলে একটি শাসক পরিবারে অন্ধকার নেমে আসত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকর হওয়ার দশ বছরের মধ্যে বাংলার জমিদারি সম্পত্তির প্রায় অর্ধেকের মালিকানা বদল হয়।

ইংরেজদের এই ভূমি ব্যবস্থা, খাজনা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কারণে এই সময় নাটোর জমিদার রাণী ভবানী কৃষকদের প্রভূত খাজনা মাফ করে দেন। এছাড়া দান, ধ্যান ও পূণ্য কর্মে অধিক ব্যয়, জমিদারির আমলাদের দুর্নীতি, স্বার্থান্ধতা, চক্রান্ত প্রভৃতি কারণে নাটোর জমিদারির ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ফলে জমিদারের আমলে কৌশলে জমিদারের অংশ বিশেষ নিলামে কিনে নিয়ে নব্য জমিদাররূপে আত্মপ্রকাশ করে।[১৯] বড় বড় জমিদারিগুলো ভেঙ্গে অঞ্চলে অন্যান্য জমিদারির সাথে তাড়াশ জমিদারির সৃষ্টি হয়। তাড়াশের পূর্ব দিকে প্রায় দশ মাইল দুরে চড়িয়াগ্রাম ছিল তাড়াশ জমিদারদের আদি নিবাস তাড়াশবংশের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব তালুকদার রায়গঞ্জ থানার চান্দাইকোনার নিকটবর্তী কোদলা গ্রামের চৌধুরী উপাধিধারী বাংলার কায়স্থদের বাড়ীতে মুৎসদ্দিওয়াদায় কাজ করতেন বলে জানা যায়।[২০] আরো জানা যায় যে বাসুদেব নবাব সরকারের অধীনে চাকুরী করে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন এবং তিনি তাড়াশের রাজবাড়ীটির নির্মাতা। বাসুদেব তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে রায় চৌধুরী উপাধি দান করেন। সাতৈল রাজের জমিদারীভুক্ত কাটার মহলের দুইশর বেশী মৌজা নিয়ে তাড়াশ জমিদারির সৃষ্টি হয় যার অধিকাংশ মৌজা তাড়াশের

Dhaka University Institutional Repository

চারদিকে অবস্থিত ছিল। বাসুদেবের দুইপুত্র জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী ও রামনাথ রায় চৌধুরী উভয়ই ঢাকার নবাব সরকারের অধীনে চাকুরী করতেন। মুর্শিদকুলী খার সময় দেওয়া রঘুনন্দনের নাটোর জমিদারি লাভের প্রেক্ষিতে সাতৈর রাজসম্পত্তি নাটোর জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। জয়কৃষ্ণের পুত্র রামরায় নাটোর জমিদারির দেওয়ান নিযুক্ত হন। তাড়াশ জমিদারদের পূর্বপুরুষদের অনেকেই নবাব সরকারের এবং নাটোর রাজের অধীনে দেওয়ানি ও মুৎসুদ্দি ওয়াদার চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন এবং এর মাধ্যমেই এই জমিদারীর উৎপত্তি বলে এরা দেওয়ান বংশ বলেও পরিচিত।

এই সময় সৃষ্ট্য নব্য জমিদারগণ সরকার নির্ধারিত খাজনা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার অবৈধ কর রায়তদের উপর ধার্য করেন। ফলে প্রজা সাধারণের দুর্ভোগ বাড়তে থাকে। কর আদায়ে জমিদার কর্মচারীদের অত্যাচার নিপীড়ন প্রজা ও জমিদারের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে যা ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের রূপ নেয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ কৃষক বিদ্রোহ নামে পরিচিত। পরবর্তীতে সমগ্র অঞ্চলসহ এর আশেপাশের জেলাগুলোতেও কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পরে। বিদ্রোহের আকস্মিকতা ও ব্যাপকতায় সিরাজগঞ্জ স্থানীয় প্রশাসন ফলপ্রসূভাবে তা দমনে ব্যর্থ হয়। পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করলে পুলিশি ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু কৃষক নেতা ধৃত হন এবং বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করা হয়। ১৮৭৩ সালের এই কৃষক বিদ্রোহের ফল কেবল সিরাজগঞ্জ জেলারই নয় সমগ্র বাংলার ইতিহাসে সুদূর প্রসারী হয়েছিল। এই দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক ভূমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা আইন তৈরী হয়। পরবর্তীতে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল টেনান্সি এ্যাক্ট তৈরীর মাধ্যমে স্থায়ী আইনে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ হলে এই অঞ্চল নতুন প্রদেশ পূর্ব বাংলা ও আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এটা সহজভাবে না নেওয়ায় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। এরপর বেশ কয়েকটি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে ভারত

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশ স্বাধীন হয়। এখানে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সিরাজগঞ্জ পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বস্থ প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশের এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ভূমি ব্যবস্থায় ও বেশ কিছু পরিবর্তন আসে এবং ১৯৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আইনের দ্বারা জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগলিক দূরত্ব ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য সর্বোপরি পশ্চিম পাকিস্তানী সরকারের বৈষম্য নীতির কারণে ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দেয়। তাড়াশ বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা।

তাড়াশ

আয়তন ও অবস্থান :

তাড়াশ উপজেলা সিরাজগঞ্জ জেলার পশ্চিমাংশ ঐতিহাসিক চলনবিলের মধ্যে অবস্থিত। এ উপজেলাটি প্রায় ২৪.২০' ও ২৪.৩৪' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.১৫' ও ৮৯.২৭' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সিরাজগঞ্জ সদর থেকে তাড়াশ উপজেলা সদরের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। উপজেলার মোট আয়তন ২৯৭.২০ বর্গ কি.মি.। তাড়াশ চলনবিলের মধ্যস্থিত উপজেলা। তাড়াশ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, নাটোর জেলার সিংড়া গুরুদাসপুর, আত্রাই, পাবনা জেলার চাটমোহর, ফরিদপুর, ভাঙ্গুড়া উপজেলা সমন্বয়ে চলনবিল গঠিত। চলন বিল একটি নিম্নভূমি অনুন্নত এলাকা। অতীতে এই বিল অনেক গভীর ও অত্যন্ত বিপদসংকুল ছিল। অনুমান করলে অন্যায় হবে না যে চারশত বছর পূর্বে এই বিলটি রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলার অধিকাংশ স্থান জুড়ে ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সঙ্গমস্থলের উত্তর পশ্চিম অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। কালের পরিক্রমায় পলি জমে বিলটি ভরাট হয়ে উঠেছে

Dhaka University Institutional Repository

এবং এর বিভিন্ন চরে অনেক গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবস্থান, আকৃতি, প্রকৃতি দেখে চলনবিলকে উত্তর বাংলার নদ-নদী স্নায়ুজালের নাভিকেন্দ্র বললে অত্যুক্তি হবে না। সার্বক্ষণিক বিশাল বিলের পানি চলমান বা প্রবাহমান থাকার কারণে এই বিলের নাম হয় চলনবিল।

অতীতকালে চলনবিল এলাকা ঘাস, জঙ্গল ও বন্যপ্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। চলনবিলের বিশেষ করে তাড়াশ অঞ্চলের দস্যু-তস্করদের উপদ্রব রোধকল্পে তাড়াশ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাড়াশ শব্দ স্থানীয় তরাশ বা ত্রাস বা ভয় শব্দ হতে উদ্ভব। রায় উপাধিধারী জমিদার, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত নাগবংশীয় সেবাইত সুলতানী, মুঘল এবং নবাবী আমলের মুসলিম ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ তাড়াশ।

বর্তমানে তাড়াশ উপজেলাটি তালম, বারুহাস, সগুনা, মাগুড়া বিনোদ, নওগাঁ, তাড়াশ, মাধাইনগর ও দেশীগ্রাম এই আটটি ইউনিয়ন, ১৭৮টি মৌজা ও ২৫২টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। তাড়াশ উপজেলায় সাধারণত দুটি ধর্মের লোকের সংখ্যা বেশি। মুসলমান ও হিন্দু। এছাড়া এখানে খ্রিস্টান ধর্মের লোক সামান্য পরিমানে বসবাসরত। সংখ্যার দিক থেকে তাড়াশে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি।

তথ্য নির্দেশ

১. G.Bhatthacharya, 'National Muscum Prasasti of Pahila', *Journal of Bengal Art*, Vol.2, Dhaka, ICSBA, 1997, p.114.

২. *Ibid.*

৩. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ পৃ. ৩৮০।

৪. রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৫. রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৬।

৬. Parmeshwari Lal Gupta, *Coins and History of Medieval India*, Complied & edited by Sanjay Garg, Delhi, Rahul Publishing House, 1997, p.17.

৭. মীনহাজ-উজ-সিরাজ, *তবকাত-ই-নাসিরী*, অনুবাদ- আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ ২৯।

৮. Epigrahia Indica, Arabic and Persian Supplement, ed. by. Z.A. Desai, New Delhi, ASI, 1983, p. 718.

৯. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসের দু' শো বছর*, কলকাতা, ভারতী বুকষ্টল, ১৯৯৮, ৬ষ্ট সংস্করণ পৃ. ১০২-১০৫।

১০. Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, p.127

১১. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩ পৃ. ৪১৩

১২. আয়শা বেগম, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২, পৃ.২৯০

১৩. করিম, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৩৮৩

১৪. করিম, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৩৮৬

১৫. করিম, *প্রাগুক্ত* পৃ. ১৫৯

১৬. আব্দুল করিম, নবাবি আমলে রাজনীতির ধারা, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ৭৬।

১৭. *ঐ*, পৃ. ৬৫।

১৮. বাংলাদেশের জেলা গেজেটিয়ারস, পাবনা, পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. সাইফুদ্দিন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পা.), *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী, রাজশাহী অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮, পৃ. ৭৩৭।

২০. রাধারমণ সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ১-৬ খন্ড একত্রে, ঢাকা নবধারা প্রকাশন, ২০০৬, পৃ.২৪১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবগ্রাম ভাগনের (ভাঙা) মসজিদ, নবগ্রাম, তাড়াশ

চিত্র : ৪-৭, ভূমি-নকশা : ১

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ ইউনিয়নে ভাগনে মসজিদটি অবস্থিত। নবগ্রাম শাহী মসজিদ থেকে এর অবস্থান প্রায় ১৮২.৮৮ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। একটি উঁচু ঢিবির উপর মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।

বর্ণনা : আয়তাকার এ মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২৫.১০ মিটার এবং প্রস্থে ৯.৬০ মিটার এবং দেয়াল চার মিটার প্রশস্ত। এ বিলুপ্ত প্রায় মসজিদের ভিতরে ধ্বংসাবশেষ দেখে অনুমান করা হয় যে, "মসজিদটি ছিল তিন 'আইল' ও পাঁচ 'বে' বিশিষ্ট"।[১] ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের ভিতরে ধ্বংসাবশেষের ভূমি-নকশা পর্যবেক্ষণ করলে এ মসজিদে কতগুলো সারিতে মোট কতটি গম্বুজ ছিল তা আর বর্তমানে অনুমান করা সম্ভব নয়। পূর্ব-পশ্চিমে বিভক্ত সাতটি ও উত্তর-দক্ষিণে তিনটি সারিতে এই আয়তাকার মসজিদটি মনে হয় একুশ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।[২] চারটি অষ্টকোণাকৃতি মিনার ছিল যার চিহ্ন এখনো বিদ্যমান।[৩] মসজিদটির দেয়াল মধ্যযুগের প্রথম ভাগের ক্ষুদ্র ইটে নির্মিত ছিল। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও পশ্চিম পার্শ্বের মিহরাবের চিহ্নটি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের অভ্যন্তরে চার পাঁচটি ভগ্ন পাথরের স্তম্ভ এখনো প্রথিত অবস্থায় দেখা যায়।

অলংকরণ : মসজিদের পাথর গুলিতে বেশ কারুকার্য রয়েছে। প্রত্যেকটি পাথরের মাথার দিকে জীবজন্তু, ফুল, লতা-পাতার নকশা দেখা যায়। একটি পাথরের মাথায় অলংকৃত

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তিমুখের খোদিত অলংকরণ রয়েছে যা থেকে এই স্তম্ভগুলো হিন্দু মন্দিরের অংশ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

নির্মাণ কাল : মসজিদে পার্শ্বে একটি ঢিবি থেকে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। [৪] শিলালিপি অনুসারে মসজিদিটির নির্মাণকাল ৮৫৮ হিজরী (১৪৫৪ খ্রি.)। শিলালিপিটি বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত আছে। শিলালিপি পাঠে আরও জানা যায় যে, মসজিদটি সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়ে খিত্তা সিমলাবাদের একজন সুদক্ষ শাসনকর্তা উলুগ রহিম খান কর্তৃক নির্মিত হয়।

শিলালিপি:

১ম اما بعد حمد الله على نعمائه والصلوة على النبى واحبابه و لما اظهر شعائر الشرع و احركه
امنه سلطان العصر و الزمان ناصر الدنيا و الدين ابو المظفر محمود شاه السلطان خلد الله
ملكه و سلطانه فى خطة رفيعة (ريفة) موسومة بسملا باد و لما اهدى جناب الاعظم

২য় صار اكرم العصر والاسلام الذى خوطب بخطاب مجلس منصوص (منصرم ؟) مازال كاسمه
منصورا و لما عزم لعرف مسجدالبجعله ذخيرة فى دار الجزاء الى يوم الساعة خان المعظم
عضد الاسلام و المسلمين خان الاعظم و خاقان المعظم الغ رحيمخان يبقى الله ثراه وجعل
الجنة مثواه و وفقه

৩য় الله قلع اعداء الله من الكفار والمشركين وادار الانعام على العلماء والمتعلمين مورخا
فى الثانى والعشرين من ذى العقدة فى يوم الجمعة سنة ثمان وخمسين و ثمانماية

বাংলা অনুবাদ :

১ম সারি : আম্মা বা'দ (এরপর) আল্লাহর অশেষ করুণার জন্য তাঁর প্রশংসা। মহানবী (সা.) এবং তাঁর সহচরগণের উপর সালাত ও প্রশান্তি। যখন শরীয়তের বিধানের প্রতি বিমুখতা পরিলক্ষিত হয়েছিল তখন যুগ ও সময়ের সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ আস-সুলতান, আল্লাহ তাঁর সাম্রাজ্য ও শক্তি দীর্ঘায়িত করুন, তাঁর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছিলেন। একটি উঁচু খিত্তা ও ভূখন্ডে (অথবা নদীর তীরবর্তী উর্বর অঞ্চলে) তিনি

Dhaka University Institutional Repository

আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করেছিলেন। যাকে 'সিমলাবাদ' নামে চিহ্নিত করা যায়। যখন জনাব আল-আযম বা বিরাট ব্যক্তিত্ব সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলেন।

২য় সারি : তখন সেই শহর এবং ইসলামের সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন, এবং তিনিই মজলিস মনসুস উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর নামের ন্যায় তিনি বিজয়ীর গৌরব অর্জন করতে থাকবেন। তিনি যখন কোনো কাজের ইচ্ছাপোষণ করতেন তখন পরকালের বিচার দিনের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করতেন। এই ব্যক্তি সম্মানিত খান, ইসলাম ও মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষক খান আল-আযম এবং খাকান আল মুয়াযযাম উলুগ রহিম খান। আল্লাহ তাঁর যশ ও সম্পদ স্থায়ী রাখুন এবং তাঁকে বেহেশতের অধিবাসী করুন।

৩য় সারিঃ আল্লাহ তাঁকে আল্লাহর শত্রু অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিকদের মূল উৎপাটন এবং আলিম, জ্ঞানী ও শিক্ষার্থীদের পারিতোষিক পুনঃপুন প্রদান শক্তি দান করুন। যিলকাদ মাসের ২২ তারিখ জুমার দিন ৮৫৮ হিজরিতে (অক্টোবর ১৪৫৪ খ্রিষ্টাব্দে) এটি (মসজিদ) নির্মিত হয়েছিল।[৫]

ধ্বংসপ্রাপ্ত এ মসজিদের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা ছোট বড় প্রস্তর খণ্ড, মিহরাব এবং কয়েকটি স্তম্ভ জরাজীর্ণ অবস্থায় টিকে আছে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ইমারত।

Dhaka University Institutional Repository

নবগ্রাম শাহী মসজিদ, নবগ্রাম, তাড়াশ

চিত্র : ৮-১১ ভূমি-নকশা : ২

অবস্থান : নবগ্রাম শাহী মসজিদটি তাড়াশ থানা সদর থেকে ৭ কি.মি. দক্ষিণে নওগাঁ গ্রামে অবস্থিত।

বর্ণনা: নবগ্রাম শাহী মসজিদের ভূমি নকশা দুটি অংশে বিন্যাস্ত। বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট মূল নামাজগৃহ বা জুল্লাহ এবং এর সম্মুখে তিনটি গম্বুজে আচ্ছাদিত একটি আয়তাকার বারান্দা নিয়ে গড়ে উঠেছে মসজিদটির সামগ্রিক পরিকল্পনা। মসজিদের বর্গাকার জুল্লাহর প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ৭.৩২ মি.। পূর্বদিকে সম্মুখের অংশের পরিমাপ ৩.৩৫ মি. × ৭.৩২ মি.। মসজিদে প্রবেশের জন্য রয়েছে পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে ১টি করে মোট তিনটি খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশ পথ। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব আছে। কেন্দ্রিয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত উঁচু। পাশ্ববর্তী মিহরাবদ্বয়ের উচ্চতা ১.২৫ মি.। তিন ধাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বার রয়েছে যার উচ্চতা ০.৯৩ মি.। এ মসজিদের বুরুজের সংখ্যা ছয়টি এবং বুরুজগুলি গোলাকৃতির। কার্ণিশ বক্র। বারান্দায় দুটি প্রস্তর স্ত ম্ভ আছে। প্রস্তর স্তম্ভ দুইটির প্রত্যেকটির ব্যস প্রায় ১.৮৩ মিটার। গম্বুজ নির্মাণে পানদানতিফ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সুলতানি বাংলার স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মসজিদটি ইটে নির্মিত। অনুচ্চ প্রবেশপথ অলংকরণবিহীন পুরু দেয়াল সুলতানি স্থাপত্যের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা আলোচ্য মসজিদে লক্ষ করা যায়।

অলংকরণ : মসজিদটির অলংকরণে প্রধানত ব্যবহৃত হয়েছে পোড়ামাটির অলংকরণ। গম্বুজ এবং দেয়াল বর্তমানে পলেস্তারা দিয়ে আবৃত এগুলোর উপর চুনকাম করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পোড়ামাটির অলংকরণ মূলত ব্যবহৃত হয়েছে মিহরাব ও বহির্দেয়ালে প্যানেল নকশায়। মসজিদের ফাসাদের উত্তর দেয়ালে নিপুণ পোড়ামাটির প্যানেল নকশা অলংকরণের অবশিষ্টাংশ এখনো দৃশ্যমান রয়েছে পার্শ্ববুরুজগুলি তিন অংশে মোল্ডিং নকশা সম্বলিত। প্রবেশ পথগুলো আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে সংস্থাপিত এবং অবতল নকশাযুক্ত। দ্বিবলয় থেকে সৃষ্ট কৌণিক খিলান নবগ্রাম শাহী মসজিদে লক্ষণীয় এবং পশ্চিম দেয়ালে বাইরের দিকে কেন্দ্রীয় অবতল মিহরাবের পশ্চাৎভাগের বর্ধিত অংশ দৃশ্যমান। দেয়ালগাত্রে প্যানেলের মধ্যে ঝুলন্ত ফুলেল নকশা রয়েছে। খিলানের উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে ঝুলন্ত নকশা শোভা পেতে দেখা যায়। মিহরাবে ঝুলন্ত শিকলের নকশা এবং মিহরাবের উপরিভাগে ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা লক্ষ করা যায়।

436740

নির্মাণকাল : তাড়াশ থানার যে সব মুসলিম স্থাপত্যকীর্তি রয়েছে তাদের মধ্যে নওগাঁ বা নবগ্রামে নির্মিত মসজিদটি প্রাচীনতম। নবগ্রাম শাহী মসজিদের শিলালিপি বর্তমানে রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। শামসুদ্দীনের পাঠের পর আব্দুল করিম এর সঠিক পাঠ দেন। শিলালিপি পাঠে জানা যায়, সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের শাসন আমলে আজিয়াল মিয়া জংদার ৯৩২ হিজরীতে (১৫২৬ খ্রি.) মসজিদটি নির্মাণ করেন।

শিলালিপি :

১ম قال النبى صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا فى الدنيا بنى الله تعالى سبعين قصرا فى الجنة- بنى من (sic) هذ المسجد فى عهد السلطان ابن السلطان ناصرالدنيا والدين ابو المظفر نصرت شاه السلطان ابن حسين شاه -

২য় السلطان خلد الله ملكه و سلطانه واعلى امره و شانه - باتى هذا المسجد المعظم اجيال مينا جنگدار من منورانا مبربحر فى العصر خان معظم مبارك خان ناظر سلمهما الله تعالى فى الدارين مورخا ٤ من ماه رجب رجب قدره سنة اثنى و ثلثين و تسعماية ٩٣٢ بهلل

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা অনুবাদ :

১ম সারিঃ মহানবী, তাঁর উপর আল্লাহর করুণা এবং শান্তি বর্ষিত হোক। "তিনি বলেছেন যিনি পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করবেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা তার জন্য বেহেস্তে সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।" মসজিদটি সুলতান হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নাসির আল দুনিয়া ওয়াল দীন আবুল মুজাফফর নুসরত শাহের শাসন আমলে নির্মিত।

২য় সারিঃ হে আল্লাহ সুলতানের রাজ্য এবং সার্বভৌমত্বকে স্থায়িত্ব দান করুন এবং তার কার্যাবলী এবং মর্যাদাকে সুসংহত করুন। এই মহান (বৃহৎ) মসজিদের নির্মাতা হলেন আজায়েল মিয়া জংদার এবং তিনি ছিলেন মীর বহর মানাওয়ার আনা (অথবা মুনু রানা) এর পুত্র। খান মুয়াজ্জম মুবারক খান নাজিরের শাসন আমলে এটি নির্মিত হয়েছিল। আল্লাহ তাঁদের উভয়কে ইহজগত ও পরজগতে শান্তিতে রাখুন তারিখ ৪ঠা রজব, এর অবস্থান সম্মানিত হোক, ৯২৩ হিজরি (১৬ই এপ্রিল, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ) ; (খোদাই নকশাবিদ) বাহলুল। [৬]

বর্তমানে শাহী মসজিদটি একটি মসজিদ কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত। মসজিদ এবং মসজিদের সামনে বারান্দায় অবস্থিত মাজারের প্রদত্ত অর্থ ও ওরসে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে মসজিদের উত্তর পার্শ্বে নওগাঁ শরীফিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মাজারে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে মসজিদ, মাজার ও মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহ হয়। অপরিকল্পিতভাবে স্থানীয় জনসাধারণ মসজিদটি সংস্কার ও নবায়ন করায় এ মসজিদের আদি রূপ প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। মসজিদের প্রধান গম্বুজটি ফাটল ধরে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলে পুরাতন গম্বুজটি ভেঙ্গে ফেলে পুনরায় অনুরূপ একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। প্রতি বৎসরই নানাভাবে সংস্কারের নামে মসজিদটি ভাঙ্গা গড়া চলছে। বারবার সংস্কারের ফলে এ মসজিদটির আদি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত মসজিদে চুনকামের ফলে এবং অলংকরণের উপরে নানা রং লেপন

Dhaka University Institutional Repository

করায় আদি নকশা লুপ্ত হয়ে গেছে। আদি মসজিদে কোন মিনার ছিল না। সম্প্রতি মসজিদের সামনে দক্ষিণ-পূর্ব পাশে বেমানান ৬০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি মিনার নির্মাণ করা হয়েছে। মিনারটিতে অভ্যন্তর ভাগ দিয়ে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত প্যাঁচানো সিঁড়িযুক্ত এবং এর শীর্ষভাগ একটি ছোট গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। নওগাঁ শাহী মসজিদ প্রাঙ্গণ বাংলা ১৩৩৪ সন পর্যন্ত নানা প্রকার কাঁটাগাছ ঘেরা জনমানব শূন্য পরিত্যক্ত এলাকারূপে বিরাজমান ছিল। বহুদিন সংস্কারের অভাবে অনেক ক্ষয়ক্ষতির পর সম্প্রতি স্থানীয় জনসাধারণ সংস্কার করে একে ব্যবহার উপযোগী করে তুলেছে।

বারুহাস মসজিদ

চিত্র : ১২

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলা সদর থেকে ১১ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে এবং বারুহাস ইউনিয়ন পরিষদ অফিস ও বারুহাস বাজার থেকে প্রায় ১৮৩ মিটার পশ্চিমে বারুহাস গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত।

বর্ণনা : আয়তাকার তিনগম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১১.৬০ মি. এবং প্রস্থে ৩.৬০ মি.। মসজিদে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকে তিনটি প্রবেশ পথ ও পশ্চিম দেয়ালে অভ্যন্তরভাগে তিনটি মিহরাব আছে। তিন ধাপ বিশিষ্ট একটি মিম্বার আছে। উত্তর দক্ষিণে একটি করে মোট দুটি জানালা এবং পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে দুটি করে চারটি প্রদীপ রাখার কুলুঙ্গি আছে। মসজিদটির চার কোণে চারটি পার্শ্ববুরুজ আছে। মসজিদের ছাদটি তিনটি গম্বুজের মাধ্যমে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মধ্যবর্তী গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজের চেয়ে কিছুটা বৃহত্তর যা মুঘল স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মধ্যবর্তী গম্বুজটির উচ্চতা প্রায় একত্রিশ মিটার। পাশ্ববর্তী গম্বুজ দুটির উচ্চতা আটাশ মিটার। দুই গম্বুজের মধ্যবর্তী স্থানে একটি

Dhaka University Institutional Repository

করে মোট দুটি বুরুজ গম্বুজের শীর্ষ দেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। গম্বুজ উত্তোলনে স্কুইঞ্চ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। 'আইল' বা 'বে' এর উপরিভাগ বর্গে রূপান্তরিত করে তার উপর গম্বুজ উপস্থাপিত করা হয়েছে। গম্বুজগুলো গোলকবৎ বটে কিন্তু দেখতে অত্যন্ত সুন্দর। মসজিদের সামনে একটি উন্মুক্ত বারান্দা রয়েছে।

অলংকরণ : সম্পূর্ণ পলেস্তারা আচ্ছাদিত মসজিদের পূর্ব ফাসাদ খোপ নকশার সাহায্যে চমৎকারভাবে অলংকৃত। বন্ধ খিলানের মধ্যস্থলে অলংকরণ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরে মিহরাবে স্টাকোর অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া গম্বুজের ভিতরেও নকশা পরিলক্ষিত হয়।

নির্মাণকাল : মসজিদ গাত্রে উৎকীর্ণ তারিখ হতে জানা যায় যে, ১৩২০ বাংলা সালে দেলোয়ার আলী খান বারুহাস মসজিদটি নির্মাণ করেন। বারুহাস মসজিদটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে মুঘল স্থাপত্যরীতির অনুকরণে নির্মিত। লক্ষনীয় যে, এই মসজিদের প্রবেশ পথগুলোয় খিলানের পাশাপাশি লিন্টেল বা সর্দলও ব্যবহৃত হয়েছে। আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ পরিকল্পনা মুঘল স্থাপত্যরীতির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রাক-মুঘল যুগ থেকেই এই পরিকল্পনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন গৌড়ের জাহানিয়া মসজিদ (১৫৩৫ খ্রি.), মুর্শিদাবাদের খেড়াউড়ে নির্মিত মসজিদ (১৫৯৪ খ্রি.), তবে বগুড়া জেলার শেরপুরে নির্মিত খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২ খ্রি.) বারুহাস মসজিদের উপর এ রীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গদাই সরকার মসজিদ

চিত্র : ১৩ ভূমি-নকশা : ৩

অবস্থান : এক গম্বুজ বিশিষ্ট গদাই সরকার মসজিদ তাড়াশ উপজেলা থেকে প্রায় ৩.২০ কি.মি. পশ্চিমে ও বারুহাস ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ৮ কি.মি. পূর্বে কোহিত তেঁতুলিয়া গ্রামে অবস্থিত।

বর্ণনা : সম্পূর্ণ ইটের তৈরী এবং পলেস্তারা আচ্ছাদিত এ মসজিদটির ভূমি পরিকল্পনা বর্গাকার। এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ ক্ষুদ্র মসজিদটির পরিমাপ ৩.৫০ × ৩.৫০ মিটার। এর উচ্চতা ৬ মিটার। ছাদ থেকে গম্বুজের উচ্চতা দুই মিটার ও দেয়ালের প্রশস্থতা ০.৭০ মিটার। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব এবং পূর্ব, উত্তর দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে ৩টি প্রবেশ পথের অস্তিত্ব দেখা যায়। মিহরাবের দুই পার্শ্বে দেয়ালে দুটি অবতল কুলুঙ্গি রয়েছে। মসজিদের ছাদের কার্ণিশ সমান্তরাল এবং মসজিদের চারকোণে চারটি গোলায়িত পার্শ্ব বুরুজ রয়েছে। বর্গাকৃতির প্রার্থনা কক্ষের ছাদটি অষ্টভূজাকৃতির ড্রামের উপর স্থাপিত ও একটি গম্বুজে আচ্ছাদিত। গম্বুজটি পেনডেনটিভ পদ্ধতিতে নির্মিত।

অলংকরণ : ক্ষুদ্র এ মসজিদটিতে তেমন কোন অলংকরণ পরিলক্ষিত হয় না। গম্বুজের চারদিকে পদ্ম পাপড়ির ন্যায় মারলন নকশা দ্বারা অলংকৃত।

নির্মানকাল : মসজিদটিতে কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণকাল সর্ম্পকে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে এ অঞ্চলের অন্যান্য ইমারতের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায়, মসজিদটি সপ্তদশ শতকের শেষদিকে নির্মিত। মসজিদটির ভূমি পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নির্মাণ কৌশল ও উপকরণ সব কিছুই ঐতিহ্যবাহী মুঘলরীতির অনুকরণে

Dhaka University Institutional Repository

নির্মিত। তবে মুঘল যুগের ঐতিহ্যের স্মৃতি সংরক্ষণের এক দুর্বল প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। চুন সুরকি নির্মিত দেয়াল, পলেস্তারা প্রক্ষেপিত স্ট্যাকো অলংকরণ এবং তাতে মারলন নকশার ব্যবহার স্পষ্টতই বাংলায় মুঘল স্থাপত্য রীতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

সিরাজগঞ্জ জেলায় মসজিদ স্থাপত্যের পূর্ব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এ অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়েছে সুলতানি আমলে। শাহজাদপুরে অবস্থিত মঘদুম শাহদৌলা শহীদের মাজার সংলগ্ন মসজিদটি এ অঞ্চলের সর্ব প্রাচীন জ্ঞাত নির্দশন।[৭] এছাড়াও ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত নবগ্রাম শাহী মসজিদ সুলতানি আমলের আর একটি উল্লেখযোগ্য নির্দশন।[৮] এসব মসজিদের অবস্থানই প্রমাণ করে ষোড়শ শতকের পূর্বে এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি এবং মুসলিম জনগোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটে। মুঘল শাসনের অনেক পরে নির্মিত এ মসজিদটির আয়তন ও আকৃতি দেখে মনে হয় যেন ঐ সময় পর্যন্ত ও এখানে মুসলিম জনসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। মসজিদের অভ্যন্তরের স্বল্পায়তন পরিসর এবং কেবল একসারি মুসুল্লী দাঁড়ানোর ব্যবস্থা সে রকমই ইঙ্গিত দেয়। এই ধারণাকে গ্রহণ করার মতো জোরালো কোন যুক্তি অবশ্য নেই। মসজিদটি নির্মাণ শৈলীতে মুঘল স্থাপত্যের যে প্রভাব লক্ষ করা যায়, তা থেকে বরং এটাই অনুমিত হয় এগুলো ছিলো এ অঞ্চলে আগত কোন কর সংগ্রাহকের জন্য নির্মিত একান্ত ব্যক্তিগত প্রার্থনাগৃহ। পরবর্তী মুঘল যুগে (Late Medieval Mughal Period) বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুঘল প্রশাসনের চরিত্র ছিলো এরকমই। কোন মুঘল সম্রাট কিংবা যুবরাজই এ অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন নি। মুঘল অভিজাতরাও বাংলায় স্থায়ী নিবাস গড়তে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না।

সিরাজগঞ্জে গদাই সরকারের মসজিদ ছাড়াও বিয়ারা, খারিজা ঘুঘাট মসজিদও ইত্যাদি একই আয়তনে ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত। বর্তমানে গম্বুজের উপরের অংশ ভেঙ্গে গেছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

দেয়ালে মারাত্মক কয়েকটি ফাটল দেখা দিয়েছে। এছাড়া দেয়ালে এবং গম্বুজের উপরে নানা ধরনের আগাছা জন্মেছে যা এর অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ। মুঘল পরবর্তী এ ঐতিহাসিক মসজিদটি আশু সংরক্ষণ করা দরকার।

ইসলামপুর জামে মসজিদ

চিত্র : ১৪ ভূমি-নকশা : ৪

অবস্থান : তাড়াশ থানা হতে ৫ কি.মি. দক্ষিণ পশ্চিমে ইসলামপুর (প্রাচীন নাম দেবীপুর) গ্রামে এই মসজিদ অবস্থিত।

বর্ণনা : আয়তকার এ মসজিদটি উত্তর দক্ষিণে ১৩.৭২ মিটার এবং পূর্ব পশ্চিমে ৯.১৪ মিটার। পরবর্তীতে এখানে একটি বারান্দা সংযোজিত হয়েছে যার আয়তন ৯.১৪ মিটার × ৭.৬২ মিটার। মসজিদের পূর্বে তিনটি এবং উত্তরে একটি মোট চারটি প্রবেশ পথ রয়েছে। দক্ষিণে দুইটি এবং উত্তরে একটি জানালা রয়েছে। মসজিদের একটিমাত্র মিহরাব যার উচ্চতা ৩.০৫ মিটার। পশ্চিম দেয়ালে দুটি প্রদীপ রাখার কুলুঙ্গি রয়েছে। মসজিদটি পাঁচটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। সবচেয়ে বড় গম্বুজটির উচ্চতা ৯.১৪ মিটার এবং অন্যান্যগুলি ৬.১০ মিটার। কেন্দ্রীয় আইলটির দু'পাশে আড়াআড়িভাবে খিলান নির্মাণ করে বর্গের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বর্গের উপর উত্তোলিত করা হয়েছে গম্বুজ। এখানে উল্লেখ্য যে, মসজিদের উত্তর দিকে একটি প্রবেশ পথ নির্মিত হয়েছে কিন্তু উত্তর দিকে কোনো প্রবেশ পথ নেই। আর দক্ষিণে এর জানালার সংখ্যা দুটি কিন্তু উত্তর দিকে একটি। দরজা ও জানালার মধ্যকার এই অসামঞ্জস্যতা পরিকল্পনাহীনতার পরিচয় বহন করে। মসজিদে পাঁচটি গম্বুজ রয়েছে। দুটি দক্ষিণ দিকে এবং দুটি উত্তর দিকে। আর মধ্যস্থলে রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রিয় গম্বুজটি। গম্বুজের এরূপ ব্যবস্থাপনা মসজিদ স্থাপত্যর খুব একটা জনপ্রিয় না হলেও সুলতানি আমলের পরবর্তী যুগ ও মুঘল আমলে সূচনাকালের বেশ কয়েকটি মসজিদে এই পরিকল্পনা লক্ষ করা যায়। যেমন- চাঁদপুরের ওয়ালীপুর আলমগীরি মসজিদ (১৬৯২), অষ্টগ্রামের কুতুব শাহী মসজিদ ইত্যাদি মসজিদে একই পরিকল্পনা দেখা যায়।

অলংকরণ : মসজিদটি বার বার সংস্কারের ফলে ফাসাদে কোন অলংকরণ পরিলক্ষিত হয় না। মসজিদের ভিতরে মিহরাবের চতুর্দিকে ফুললতাপাতার নকশা এবং গম্বুজের অভ্যন্তরে অনুরূপ নকশা দেখা যায়।

নির্মাণকাল : ১৮০২ সালে মরহুম আছির উদ্দিন মুন্সি ও ছাবেদার রহমান জনগণের সহযোগিতায় এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। যদিও মসজিদটি কোম্পানী আমলে নির্মিত কিন্তু পরবর্তী মুঘল বৈশিষ্ট্য এখানে পরিলক্ষিত হয়।

সংস্কারের ফলে মসজিদটির বর্তমান অবস্থা ভাল। এই ইমারতটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত নয়; স্থানীয় জনগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি মসজিদটি দেখাশোনা করেন।

সান্দুরিয়া জামে মসজিদ, সান্দুরিয়া, তাড়াশ

চিত্র : ১৫ ভূমি-নকশা : ৫

অবস্থান : তাড়াশ থানা সদর থেকে প্রায় ১২ কি.মি. পশ্চিমে সগুনা ইউনিয়নের সান্দুরিয়া গ্রামে এই মসজিদটি অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা : আয়তাকার এই ক্ষুদ্র মসজিদটি ১.০৭ মিটার উঁচু একটি ঢিবির উপর নির্মিত। এর বাইরের দিকের দৈর্ঘ্য ১১.১৮ মিটার ও প্রস্থ ৪.৫৭ মিটার। অভ্যন্তরভাগে মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৮ মিটার ও প্রস্থে ২.২৯ মিটার। ক্ষুদ্র এই ইমারতটি তিনটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। বর্তমানে গম্বুজ তিনটি আর আগের অবস্থায় নেই। ভূমিকম্পে কেন্দ্রীয় গম্বুজটি ভেঙ্গে পড়লে স্থানীয় জনগণ এটি পুনঃনির্মাণ করেন। সম্প্রতি মসজিদের পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযোজিত হয়েছে। মসজিদের পূর্বদিকে তিনটি খিলানকৃত এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে মোট পাঁচটি প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথগুলির উচচতা ১.৬৫ মিটার ও চওড়া ০.৭৬ মিটার। পশ্চিম দেয়ালে একটিমাত্র মিহরাব আছে যার উচ্চতা প্রায় ১.৫২ মিটার। মসজিদের চারকোণে চারটি স্তম্ভ এবং প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বেও রয়েছে একটি করে সরু নিমগ্ন স্তম্ভ।

অলংকরণ : মসজিদটিতে তেমন কোনো অলংকরণ পরিলক্ষিত হয় না। মিহরাবে মারলন নকশা পরিলক্ষিত হয়। গম্বুজের চারিদিকেও মারলন নকশা আছে। এছাড়া প্রবেশ পথের স্তম্ভগুলোতে ইটের খোদাই নকশা দেখা যায়।

নির্মাণ কাল: মসজিদটিতে কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণ কাল সর্ম্পকে কিছু জানা যায় না। তবে এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় এটা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত।

মসজিদটি সংস্কারের ফলে বর্তমানে এর অবস্থা বেশ ভাল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক এই ইমারতটি সংরক্ষিত হয় নি। স্থানীয় জনগণ এটিকে দেখাশোনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শাহ শরীফ জিন্দানির মাজার, নবগ্রাম, তাড়াশ

চিত্র : ১৬

নওগাঁ শাহী মসজিদের সামনে বারান্দা সংলগ্ন একটি আচ্ছাদিত মাজার দেখা যায়। এই মাজারের দৈর্ঘ্য ২.৮২ মিটার, প্রস্থ ১.৮৩ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ২ মিটার। স্থানীয় লোকদের বর্ণনা মোতাবেক হযরত আব্দুল আলী বাকী শাহ শরীফ জিন্দানী নামক একজন বুজরর্গ পীরের উদ্দেশ্যে এই মাজারটি নির্মিত হয়েছিল। কথিত আছে, বাগদাদের জিন্দান শহর থেকে তিনি ষোড়শ শতকে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন।[৯] সম্প্রতি এ পীরের নামানুসারে এ গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে শরীফাবাদ।[১০] তবে পূর্বের নাম নবগ্রাম (নওগাঁ) নামেই বেশী পরিচিত।

তথ্য নির্দেশ

১. এ.কে.এম, ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্ত লিখন শিল্প,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫৫।

২. মো. খালেকুজ্জামান, *বৃহত্তর পাবনা জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন,* ঢাকা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭, পৃ.৩৮।

৩. *ঐ*, পৃ.৩৮

৪. আয়েশা বেগম, *পাবনা ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২, পৃ.১৬১।

৫. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৪।

6. A.Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*, Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1992, pp. 342-43.

Dhaka University Institutional Repository

৭. আয়শা বেগম, *আমাদের ঐতিহ্য : শাহজাদপুর মসজিদ*, ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯০।

৮. A.H. Dani, *Muslim Architectrue in Bengal*, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961, p.151.

৯. বেগম, *পাবনা ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২ পৃ. ১৭৮।

১০. শরীফ খান্দানগণ বসবাস করায় এর নাম হয় শরীফাবাদ। মো. হারুন অর রশীদ, *নওগাঁর ইতিকথা*, সিরাজগঞ্জ : রশিদুননেসা, ১৩৯১ বাংলা, পৃ.৮

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

তাড়াশ শিব মন্দির দক্ষিণমুখী (কপিলেশ্বর মন্দির)

চিত্র : ১৭-১৯ ভূমি-নকশা : ৬

অবস্থান : তাড়াশ বাজারের মধ্যস্থলে এবং তাড়াশ হাইস্কুলের ঠিক পিছনে তাড়াশ শিব মন্দিরটি অবস্থিত। প্রাচীর বেষ্টিত বর্গাকার প্রাঙ্গনে একটি দক্ষিণমুখী এবং অন্যটি পশ্চিমমুখী মন্দির রয়েছে। দক্ষিণমুখী মন্দিরটিকে কপিলেশ্বর মন্দির বলে অভিহিত করা হয়। তাড়াশে যে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে তন্মধ্যে কপিলেশ্বর শিব মন্দিরটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।

বর্ণনা : বর্গাকৃতির এই মন্দিরটির বহির্দেয়ালের পরিমাপ ৫.২০ মিটার × ৫.২০ মিটার। অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ২.৯০ মিটার × ২.৯০ মিটার। দেয়ালের প্রশস্ততা ১.৩০ মিটার এবং ভূমি থেকে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা ৩.০৫ মিটার। মন্দিরের সম্মুখে একটি মাত্র প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথের উচ্চতা ১.৫০ মিটার। প্রবেশ পথটি বহুখাজ বিশিষ্ট খিলানে নির্মিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালে দুটি কুলুঙ্গি রয়েছে। কপিলেশ্বরের মন্দিরটিতে রয়েছে বিগ্রহ মূর্তি। মন্দিরটির ছাদ চারচালা ধরনের হলেও রেখা ধরনের মন্দিরের ন্যায় ধারবিশিষ্ট। এ ধরনের সোজা ধার বিশিষ্ট রেখা মন্দিরের উদাহরণ আরো দেখা যায় হান্ডিয়ালের জগন্নাথের মন্দিরে।[১]

অলংকরণ : কপিলেশ্বর মন্দিরটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটে নির্মিত ও বিচিত্র কারুকার্য খচিত। মন্দিরের সম্মুখভাগ অত্যন্ত জাঁকালোভাবে অলংকৃত। আগাগোড়া টেরাকোটা নকশায় অলংকৃত। সামাজিক ও পৌরাণিক বিভিন্ন দৃশ্যে অলংকৃত পোড়ামাটির ফলক পাশাপাশি জোড়া লাগিয়ে মন্দির গাত্রে এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। মন্দিরের গাত্রালংকারের বিষয়বস্তুতে প্রাধান্য পেয়েছে নানা দেবদেবীর মূর্তি। এই মন্দিরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার কার্ণিশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে বক্রাকারে নির্মিত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। মন্দিরের প্যানেলের মধ্যে অবস্থান করছে বিগ্রহের প্রতিকৃতি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্যানেলের মধ্যে ফুলেল স্ক্রোল দ্বারা গাত্রকে শোভিত করা হয়েছে। মূর্তিগুলির উত্তর পার্শ্বে রয়েছে প্রতীকধর্মী বৃক্ষ। মন্দিরের স্প্যানড্রিলে প্রবেশ খিলানে একসময় ছুটন্ত ঘোড়ার প্রতিকৃতি ছিল।[২] সবচেয়ে নিচের প্যানেলগুলো সামাজিক দৃশ্যাবলী দ্বারা অলংকৃত করা হয়েছে। মন্দির অলংকরণে দুই ধরনের টেরাকোটার ব্যবহার লক্ষ করা যায়, ছাঁচে নির্মিত ফলক ও হাতে তৈরী করা ফলক। সাধারণভাবে মন্দিরের ফ্রেম ও অন্যান্য স্থাপত্যিক রেখা ধরে যে পাড় নকশা করা হয়েছে তাতে ছাঁচে নির্মিত ফলক ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- ফুল ও লতা পাতার নকশা দেখা যায় তা ছাঁচে তৈরী ফলকে উৎকীর্ণ। কিন্তু মন্দিরের অন্যান্য নকশা বিশেষ করে মূর্তিগুলো হাতে তৈরী ফলক ব্যবহার করা হয়েছে। এই কারণে সমসাময়িক টেরাকোটা অলংকরণ মন্দির স্থাপত্য অলংকরণে ভাবগত দিক হতে একটির সাথে অপরটির মিল থাকলেও উৎকীর্ণ ফলক একটির সাথে অন্যটির হুবহু সাদৃশ্য মিলে না।

নির্মাণ কাল : শিলালিপি অনুসারে কপিলেশ্বর মন্দিরটি ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। কপিলেশ্বর মন্দিরের প্রবেশ পথের উপরে পোড়ামাটির দুটি লিপি ছিল। রাধারমন সাহা কপিলেশ্বর শিব মন্দিরে দুটি শিলালিপি বিদ্যমান অবস্থায় দেখতে পান। লিপি দুটি টেরাকোটা ফলকে উৎকীর্ণ। প্রথম লিপিটি অপেক্ষাকৃত বড়। মোট পাঁচ সারিতে লেখা। শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপ :

শাকে বাজি শরা শুগেন্দু গণিতে শ্রীরাম দেবাৎ পরঃ।
শ্রীনারায়ণ দেব এব সুকৃতিঃ স্বর্ল্লোক লোকোত্তরঃ
প্রাসাদাং শ্রুতি দৃষ্টতো নিরূপমং ভক্ত্যা দ্যৈব শম্ভবে।
মাতুঃস্বর্গ সুখ প্রয়ান করনে সোপান মেকং ভূবি।
ইতি শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৫৭ শ্রীগৌরাঙ্গ জয়তি।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় ১৫৫৭ শকাব্দে (১৬৩৫ খিঃ) কৃত্তিবাস নারায়ণ দেব তাঁর মাতার স্বর্গারোহন সৌকর্য্যার্থে পৃথিবীতে সোপানস্বরূপ অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব এ কপিলেশ্বর মন্দির শম্ভুকে দান করেছিলেন।

তাড়াশ কপিলেশ্বর মন্দিরে খোদিত দ্বিতীয় শিলালিপিটি অপেক্ষাকৃত আকারে ছোট এবং চার সারিতে উৎকীর্ণ। নিচে শিলালিপির পাঠ নিম্নরূপঃ

কালাগ্নি তর্কেন্দুমিতে শকাব্দে
বয়ং শিবস্যালয় মিষ্ট কাদ্যৈঃ।
জীর্ণং ফুটঞ্চোদ্ধরতেস্ম ভক্ত্যা
তস্মিন প্রবীন বলরাম দাসঃ। [৪]

শিলালিপির পাঠ অনুসারে ১৬৩৬ শকাব্দে (১৭১৪ খ্রি.) প্রবীণ বলরাম রায় ভক্তি সহকারে এ শিব মন্দির যখন একবার ভগ্নদশায় উপনীত হয়েছিল তখন ইট দ্বারা সংস্কার করে দেন।

তাড়াশ শিব মন্দির (পশ্চিমমুখী)

চিত্র :২০ ভূমি-নকশা : ৭

অবস্থান : তাড়াশ বাজারের মধ্যস্থলে এবং তাড়াশ হাইস্কুলের ঠিক পিছনে কপিলেশ্বর শিব মন্দিরের দক্ষিণ কোণে তাড়াশ শিব মন্দিরটি অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা : বর্গাকার এই শিব মন্দিরটির পরিমাপ বাইরে থেকে ৪.০ মিটার × ৪.২০ মিটার এবং অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ২.৭৫ মিটার × ২.৭৫ মিটার। দেয়ালের প্রশস্থতা ০.৯৬ মিটার। ভূমি থেকে এর উচ্চতা ২.৭৫ মিটার। এর অভ্যন্তরে দুটি কুলুঙ্গি রয়েছে। মন্দিরের পশ্চিম ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশ পথ আছে এবং এদের উচ্চতা ১.৬ মিটার ও প্রশস্ততা ০.৬০ মিটার। মন্দিরের চারকোণে চারটি স্তম্ভ রয়েছে। স্তম্ভগুলো মন্দির দেয়াল হতে কিছুটা ভিতর দিকে ঢুকানো এবং ব্যান্ডযুক্ত। বাংলার মন্দির স্থাপত্যে বিশেষ করে চালা মন্দিরগুলোতে এই ধরনের স্তম্ভের ব্যবহার অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি রীতি। মন্দিরের ছাদের কার্ণিশ বক্রাকারে গঠিত।

অলংকরণ : মন্দিরটিতে খুব বেশী অলংকরণ দেখা যায় না। প্রবেশ পথের সামনে কিছু অলংকরণ লক্ষ করা যায়। অলংকরণে টেরাকোটা নকশায় প্রাধান্য পেয়েছে বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি। মন্দিরের মূর্তিগুলি প্যানেলের মধ্যে অবস্থান করছে। এছাড়া মন্দিরের অন্য কোথাও তেমন কোন অলংকরণ পরিলক্ষিত হয় না।

নির্মাণ কাল : মন্দিরটিতে কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণ কাল সর্ম্পকে কিছু জানা যায় না। তবে এর আকৃতি, গঠন ও অলংকরণ দেখে মনে হয় এটা কপিলেশ্বর শিব মন্দিরের সমসাময়িক বা তার অল্প কিছুকাল পরে নির্মিত (অষ্টাদশ শতক)।

রসিক রায়ের মন্দির

চিত্র : ২১-২২ ভূমি-নকশা : ৮

অবস্থান : তাড়াশ বাজারের দক্ষিণ- পূর্ব কোণে রসিক রায়ের মন্দিরটি অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা : মন্দিরের মূল কক্ষটি বর্গাকার। এর পরিমাপ ২.৪০ মিটার × ২.৪০ মিটার। মন্দিরের চারিদিকে ছাদে ঘেরা ১.৪০ মিটার প্রশস্ত বারান্দা আছে। প্রথম তলায় পাঁচটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। মন্দিরের মূল প্রবেশপথটি দক্ষিণ দিকে। পূর্ব ও পশ্চিম দিকেও অর্ধবৃত্তাকৃতির খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ আছে। এই প্রবেশ পথ দুটি দোচালাকারে নির্মিত। বাংলার মন্দির স্থাপত্যে এই ধরনের প্রবেশ পথের ব্যবহার অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন রূপ পরিগ্রহ করেছে। মন্দিরের চতুর্দিকে উন্মুক্ত অঙ্গন রয়েছে। দ্বিতীয় তলাতে উত্তর ও পূর্ব দিকে একটি করে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি করে খিলানকৃত প্রবেশ পথ। প্রথম তলার উপর চারকোণে চারটি শিখর, দ্বিতীয় তলার চারকোণে চারটি শিখর এবং মন্দিরের উপরের তলাটি অষ্টকোণাকার। এখানে স্তম্ভের উপর খিলান নির্মাণ করে আটটি খিলানের সাহায্যে একটি অষ্টভূজাকার ইমারত তৈরী করা হয়েছে। তবে এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তৃতীয় তলাটি শিখর দ্বারা নয় বরং অষ্টকোণাকার কৌণিক গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত।

অলংকরণ : মন্দির গাত্রের কোথাও কোন অলংকরণ পরিলক্ষিত হয় না। তবে ত্রিতলে আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহৃত গম্বুজের নিচে চারদিকে পদ্ম পাঁপড়ির ন্যায় মারলন নকশায় অলংকৃত। বর্তমানে এটিতে কোন পূজা হয় না এবং সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত।

নির্মাণকাল : শিলালিপি অনুযায়ী এই মন্দিরটি ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে বলরাম রায় নির্মাণ করেন।

শিলালিপি : নাটোরের জমিদার রাজা রামজীবন তাঁর অধীনস্ত তাড়াশের বলরাম রায় ও রামরাম রায়ের মাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক লক্ষ টাকা সাহায্য করেন। রামরাম রায়ের বড় ভাই কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরে মায়ের শ্রাদ্ধ উদযাপনের জন্য রাখা লক্ষাধিক টাকা দিয়ে তাড়াশের কপিলেশ্বর মন্দির সংস্কার সাধন করেন এবং নিজ বাসভবনে রসিক রায় নামক

Dhaka University Institutional Repository

মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মূর্তি স্থাপন করেন। মন্দিরটি ১৬৪০ শকাব্দ অনুসারে ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।

শিলালিপির পাঠ :

শাকে ভ্রবেদ তর্কেন্দুর্মিতে
প্রাসাদ মুক্ত মং স্ত্রীকৃষ্ণায় দদৌ
শ্রীল বলরাম মহাত্মনা।[৫]

নির্মাণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মন্দিরটিকে রাসমঞ্চ বা দোলমঞ্চ বলেই মনে হয়। পুটিয়ায় এরূপ রাসমঞ্চ লক্ষ করা যায়। তবে পুটিয়ার রাসমঞ্চটি সম্পূর্ণই অষ্টকোণাকৃতির। আর এই মন্দিরটি বর্গাকার ভিত্তির উপর অষ্টকোণাকৃতির রাসমঞ্চ।

তাড়াশ গোবিন্দমন্দির (নাটমন্দির), তাড়াশ

চিত্র : ২৩ ভূমি-নকশা : ৯

অবস্থান : তাড়াশ কপিলেশ্বর শিব মন্দির থেকে ১৮২.৮৮ মিটার উত্তরে আর একটি বড় মন্দির অবস্থিত। স্থানীয় জনগণ এটিকে গোবিন্দ মন্দির বা নাট মন্দির বলে থাকে।

বর্ণনা : তাড়াশের নাট মন্দির একটি দ্বিতল অট্টালিকা। মন্দিরের মূল কক্ষটি বর্গাকার। এর পরিমাপ ৫.২০ মিটার × ৫.২০ মিটার। মন্দিরের চারিদিক ঘেরা আচ্ছাদিত বারান্দা আছে। বারান্দার পরিমাপ ২.৭৫ মিটার। বারান্দায় প্রবেশের জন্য চতুর্দিকে একটি করে প্রবেশ পথ আছে। এর দক্ষিণ দিকে ৪ মিটার প্রশস্ত আরও একটি বারান্দা সংযোজিত হয়েছে। বারান্দাসহ সম্পূর্ণ মন্দিরটির পরিমাপ ১৭.২৫ মিটার × ১২.৭৫ মিটার। দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

তলায় একটি মাত্র কক্ষ যা প্রথম তলার মূল বর্গাকার কক্ষের উপরে একই পরিমাপে নির্মিত হয়েছে। এর চারিদিকে চারটি প্রবেশপথ খিলানের মাধ্যমে নির্মিত। এর কার্ণিশের উপরে চারদিকে মোট আটটি ক্ষুদ্র ও মাঝে একটি বৃহৎ শিখর রয়েছে। এদের প্রত্যেকটির উপরে শোভা পাচ্ছে আমলকের চূড়া।

অলংকরণ : মন্দিরটিতে তেমন কোন অলংকরণ পরিলক্ষিত হয় না। অঙ্গনের স্তম্ভের উপর নির্মিত খিলানের শীর্ষভাগে কুকুরের দাঁতের ন্যায় চোখা খাঁজ খাঁজ অলংকরণ শোভা পাচ্ছে। এর ছাদের উপর ব্যাটলমেন্ট ও প্যারাপেট নির্মিত হয়েছে ; আর প্যারাপেটের নিচে দু'সারি বর্শির আকৃতি বিশিষ্ট অলংকরণ লক্ষ করা যায়।

নির্মাণ কাল : এই মন্দিরটি ১৭৯০ (আনুমানিক) সালে তাড়াশের জমিদার রাজর্ষি রায় বনওয়ারীলাল রায় বাহাদুর এই নাট মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

মন্দির সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে একটি ইটের ভগ্নস্তুপ দেখতে পাওয়া যায়। মূলত এটি যে মন্দিরের একটি অংশ ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। মনে হয় মন্দিরের দ্বিতল ও ছাদে ওঠার জন্য এখানে একটি সিঁড়ি ছিল যা বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। [৬] মন্দির সংলগ্ন চত্বরে একটি বিরাট পাকা কূপ রয়েছে। এখানে স্থানীয় হিন্দুরা পূজা করে।

ছোট শিব মন্দির (জগন্নাথ মন্দির), তাড়াশ

চিত্র : ২৪-২৫ ভূমি-নকশা : ১০

অবস্থান : তাড়াশ বাজারে বালিকা বিদ্যালয়ের নিকটে সমতল থেকে একটু উঁচু ঢিবির উপরে এই মন্দিরটি অবস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

বর্ণনা : এই মন্দিরটি আকৃতিতে অষ্টকোণাকার। প্রতিটি বাহুর পরিমাপ ১.৮০ মিটার। মন্দিরটিতে পশ্চিম ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশ পথ আছে। মন্দিরের প্রতিটি বাহুর কার্ণিশ ধনুকের ন্যায় বক্রাকারে নির্মিত। মন্দির আচ্ছাদনে উল্টানো পদ্মের উপর অষ্টকোণাকার গম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরনের গম্বুজের ব্যবহার সাধারণত অষ্টকোণাকার মন্দিরেই অধিক লক্ষ করা যায়। অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদে এই ধরনের গম্বুজের বিকাশ ঘটে বলে মনে করা হয়।[৭] এর অভ্যন্তরে ছয়টি কুলুঙ্গী রয়েছে। এর অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ নির্মিত হয়েছে বলেই এটাকে শিব মন্দির বলা হয়। সম্পূর্ণ ইমারতটি ক্ষুদ্র ইটের তৈরী এবং চুন সুরকীর পলেস্তারায় আবৃত।

অলংকরণ : অষ্টকোণাকার প্রতিটি অংশের উপর রয়েছে বিশেষ ধরনের স্টাকো অলংকরণ। এর খিলান সমূহের স্প্যানড্রিলে ও তার উপরে প্রত্যেকটিতে বিভিন্ন প্রজাতির জন্তুর অবয়বের নকশা দ্বারা পরিশোভিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রবেশ পথের উপরে পদ্মকলি ভক্ষণরত ছুটন্ত ঘোড়ার অলংকরণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; এ ধরনের নকশা কপিলেশ্বর মন্দিরে ছিল যা এখন নাই।[৮] এছাড়া হান্ডিয়ালের জগন্নাথ মন্দিরেও একই নকশা লক্ষ করা যায়। এর গম্বুজের নিচে চারদিক ঘিরে রয়েছে পদ্ম পাপড়ির মারলন নকশা।

নির্মাণ কাল : মন্দিরটিতে কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে এর আকৃতি, গঠন ও অলংকরণ দেখে মনে হয় এটা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

বৃন্দাবন বিহারী মন্দির, তাড়াশ

চিত্র : ২৬ ভূমি-নকশা : ১১

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলা সদরে গার্লস স্কুলের প্রাচীর ঘেঁষে এই মন্দিরটি অবস্থিত।

বর্ণনা : বর্গাকার এই মন্দিরটির পরিমাপ অভ্যন্তর ভাগ থেকে ৫.০০ মিটার × ১.৭৫ মিটার। উত্তর দক্ষিণে দুটি বারান্দা আছে এবং বারান্দার পরিমাপ দৈর্ঘ্য ১.০০ মিটার ও প্রস্থ ০.৮০ মিটার।[৯] মন্দিরটিতে চারদিকে চারটি প্রবেশ পথ ছিল। কিন্তু উত্তর দিকে প্রবেশ পথ থাকলেও বর্তমানে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। প্রধান প্রবেশ পথটা দক্ষিণ দিকে তিন খিলান সহযোগে নির্মিত। খিলানগুলি দুটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত প্রবেশ পথটি একটি বক্রাকার শীর্ষযুক্ত ফ্রেমের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। পূর্ব দিকেও একই ধরনের খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথের নিচের অংশে এবং কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশে কষ্টিপাথরের ব্যবহার দেখা যায়। মন্দিরের অভ্যন্তরে বেশ কিছু কুলুঙ্গী দেখতে পাওয়া যায়। এটি একটি সমতল মন্দির ছাদ। এই ধরনের সমতল ছাদের মন্দিরকে চাঁদনী রীতিও বলা হয়। [১০] এর দক্ষিণ দিকে কার্ণিশের উপর সমদূরত্বে নির্মিত তিনটি ত্রিকোণাকার পেডিমেন্ট রয়েছে।

অলংকরণ : মন্দিরের ফাসাদে পোড়ামাটির অলংকরণ লক্ষ করা যায়। সমস্ত মন্দিরটিতে পোড়ামাটির ফলকে বিভিন্ন জীব-জন্তু ও পশু পাখির নকশা পরিলক্ষিত হয়।

নির্মাণ কাল : কৃষ্ণ কামিনী চৌধুরানী অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। তবে ডেভিড ম্যাককাচিয়নের মতে এটি উনবিংশ শতকের নির্মাণ। [১১]

ধ্বংস প্রায় এই মন্দিরটিতে বর্তমানে কোন পূজা হয় না। মন্দিরটি সংস্কার করে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

গোপাল বাড়ি মন্দির, তাড়াশ

চিত্র : ২৭

অবস্থান : তাড়াশ হাই স্কুলের পূর্বদিকে তাড়াশ জমিদার বাড়ী। জমিদার বাড়ীর মধ্যে এই মন্দিরটি অবস্থিত।

বর্ণনা : ধ্বংসপ্রাপ্ত এই মন্দিরের কিছু অংশ এখনো টিকে আছে। মন্দিরের টিকে থাকা অংশে এখনো পূজা অর্চনা হয়। একজন পুরোহিত পূজা করার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে। টিকে থাকা অংশে মন্দিরের আদি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরটি যে আকর্ষণীয় ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। জমিদার বাড়ীর প্রাচীরের কিছু অংশ এবং জমিদার বাড়ীর পূর্বদিকে শান বাঁধানো ঘাট সম্বলিত পুকুরের অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান। পাবনা জেলা সদরে অবস্থিত তাড়াশ জমিদার বাড়ী এবং এ মন্দির সমসাময়িক কালের নির্মাণ। [১২]

কাঁটার বাড়ি মন্দির, তাড়াশ

চিত্র : ২৮

অবস্থান : তাড়াশ থানা সদর থেকে প্রায় ১৫ কি.মি. দক্ষিণ পশ্চিমে সগুনা ইউনিয়নের অন্তর্গত কাঁটারবাড়ি গ্রামে এই মন্দিরটি অবস্থিত।

বর্ণনা : পুনঃনির্মিত বর্গাকার টিনের এই মন্দিরটির একেক দিকের দৈর্ঘ্য ৩.২০ মিটার এবং এর উচ্চতা ৩.৬৫ মিটার। ধ্বংসপ্রাপ্ত কাঁটার বাড়ি মন্দিরে ছিল পাথরের সূর্যদেব ও বাসুদেবের মূর্তি এবং রূপার কালি মূর্তি। এ গুলো চুরি হয়ে গেছে। মন্দিরটি যে পুরাতন

Dhaka University Institutional Repository

ছিল তা এখানে পড়ে থাকা ইটের স্তুপ থেকে অনুমান করা যায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের সামান্য কিছু অংশ আছে; যাতে টেরাকোটার সামান্য নকশা পরিলক্ষিত হয়।

কাঁটার বাড়ির কায়স্থ বাড়িতে কালো পাথরে নির্মিত দ্বিভূজবিশিষ্ট দণ্ডায়মান একটি মূর্তি ছিল।[১৩] এটি তিন হাত উঁচু ও নিপুণ কারুকাজে আকর্ষণীয়। এ মূর্তিটি সাড়ে চার ফুট সূর্যমূর্তি নামে পরিচিত। মূর্তি পাচার হয়ে যাবার সময়ে ধরা পড়ে এবং তারপর থেকে অদ্যাবধি সিংড়া থানায় রক্ষিত আছে বলে জানা গেছে। [১৪]

নওগাঁ শিব মন্দির, নবগ্রাম (নওগাঁ), তাড়াশ

চিত্র : ২৯

অবস্থান : নওগাঁ (নবগ্রাম) হাটের মধ্যস্থলে এই মন্দিরটি অবস্থিত।

বর্ণনা : ধবংসপ্রায় এই মন্দিরটির পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৪.৫০ মিটার ও প্রস্থ ২.০০ মিটার। ১ মিটার প্রশস্তে দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশ পথ আছে। মন্দিরের পূর্বদিকে একটি উন্মুক্ত অঙ্গন রয়েছে। এর আয়তন ৪.৫০ মিটার × ১.৩০ মিটার। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুটি জানালা ছিল বলে অনুমান করা যায়। এর অভ্যন্তরে উত্তর দিকে পূজার বেদী অবস্থিত এবং পূজার বেদীর দুপার্শ্বে দুটি করে অবতল কুলুঙ্গী আছে। পরিত্যক্ত এই মন্দিরটিতে বর্তমানে কোন পূজা হয় না। নওগাঁ বাজারের মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে। ধারণা করা হয় শিবলিঙ্গটি নওগাঁ শিব মন্দিরের।[১৫]

কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাণকাল সর্ম্পকে কিছু জানা যায় না। এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় যে, এটি আঠার শতকে নির্মিত।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. বেগম আয়শা, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২, পৃ. ৮৮।

২. Michell George, *Brick Temples of Bengal*, Princeton, University Press, 1983, Plate-774-78.

৩. বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭১ ; মো. খালেকুজ্জামান, *বৃহত্তর পাবনা জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন*, ঢাকা, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭, পৃ.৩৩।

৪. বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৭২।

৫. *ঐ*, পৃ. ২৭২।

৬. মো. খালেকুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ-৩৩।

৭. David j. McCutchion, *Late Medieval Temples of Bengal*, Calcutta, The Asiatic Society, 1972 p.43.

৮. Michell, *Op. Cit.*, plate- 777.

9. বেগম, প্রাগুক্ত পৃ.২২১।

১০. McCutchion, *Op. Cit.* p.62.

১১. *Ibid*, p.63.

১২. বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।

১৩. বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।

১৪. বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০৯।

১৫. বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

জমিদার বাড়ি ও অন্যান্য নিদর্শন

বেহুলার কূপ

চিত্র : ৩০

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলা সদর হতে প্রায় ৪ কি.মি. পশ্চিমে বিনসারা গ্রামে কিংবদন্তীর বেহুলা সুন্দরীর পিতা বাছোবানিয়া ওরফে সায় সওদাগরের বাড়ীর উত্তর পূর্ব কোণে এই কূপটি অবস্থিত।

বর্ণনা : বেহুলা লক্ষীনদারের কাহিনী বাংলায় একরূপ সর্বজনবিদিত। বিনসারা গ্রামে 'জীয়নকুপ' নামে চারটি অন্তর্মুখ বিশিষ্ট একটি বিরাট কূপ রয়েছে। এর গভীরতা বর্তমানে ৫ মিটার এবং মুখের মাপ ৩.৩৫ মিটার। এই কূপটি বড় অদ্ভুত ধরণের বড় বড় আগলা ইটের গাথুঁনী দ্বারা ইহা নির্মিত। সিমেন্ট বা চুন সুরকী গাঁথুনীতে ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। ইটের পাশে ইট সাজিয়ে কূপটি গড়ে তোলা হয়েছে। কিছুকাল পূর্বে কূপটি মাটির নিচে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছিল। বাইরে কূপের কোন প্রকার চিহ্ন ছিল না। আড়াংগাইল গ্রামের জনৈক নবু কয়েক বৎসর আগে কূপটি মাটি খুঁড়ে বের করেন। কূপটির অভ্যন্তরভাগ মাটিতে ভর্তি ছিল। কিছুদূর খনন করার পর এক স্তুপের মধ্যে চারটি অল্প ব্যাস বিশিষ্ট কূপ বের হয় এবং কূপগুলির মুখ চারটি মাটির কলস দ্বারা ঢাকা ছিল। মাটির কলস খুললে কতকগুলি ছোট ছোট লাল রঙের সাপ বের হয়ে পড়ে। কূপের মধ্যে চলন্ত বা ঘুরন্ত পানি ছিল বলে জানা যায়। এই কূপের পানি পান করলে যে কোন রোগ সেরে যায়-এই অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে দূর-দূরান্ত হতে দলে দলে লোক পানি নিতে আসতো। কিন্তু এখন লোকদের সে ভ্রম ভেঙ্গেছে। এর নির্মাণকাল সর্ম্পকে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নি।

Dhaka University Institutional Repository

তাড়াশে প্রাপ্ত স্থাপত্যের মধ্যে বেহুলার কূপটি সর্বপ্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত এর প্রাচীনত্বের প্রমাণস্বরূপ কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। বেহুলার কূপটির সঙ্গে প্রাচীন যুগের একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে বিষয়টি পরবর্তী গবেষণার জন্য উন্মুক্ত রইলো।

বেহুলার ভিটা

চিত্র : ৩১

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলা সদর হতে ৩.৫ কি.মি. বিনসারা বাজারের পশ্চিম দিকে কিংবদন্তীর বেহুলা সুন্দরীর পিতা বাছোবানিয়া ওরফে সায় সওদাগরের ভিটা অবস্থিত।

বর্ণনা : প্রায় ৪০ বিঘা জমি নিয়ে বাছোবানিয়ার ভিটা ছিল। গোলাকৃতি এই ঢিবির উপরের অংশ সমান। ভিটার উপর অসংখ্য ইটের টুকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঢিবির উত্তর দিকে স্থানীয় লোকেরা মাটি কাটার ফলে সেখানে ইটের গাঁথুনীর কিছু চিহ্ন লক্ষ করা যায়। তাড়াশে প্রাপ্ত স্থাপত্যের মধ্যে বেহুলার কূপটি সর্বপ্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত এর প্রাচীনত্বের প্রমাণস্বরূপ কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। বেহুলার কূপটির সঙ্গে প্রাচীন যুগের একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে বিষয়টি পরবর্তী গবেষণার জন্য উন্মুক্ত রইলো। বর্তমানে বেহুলার পিতার ভিটায় তৈরী হয়েছে বিনসারা প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্থানীয় তহশিল অফিসে স্কুলের পরিচিতির সাথে লেখা রয়েছে "ঐতিহাসিক বেহুলার বাড়ি"।[১] ঢিবির পশ্চিমে নৌকার আকৃতির আর একটি ঢিবি লক্ষ করা যায়। স্থানীয় লোককাহিনী মতে পাশের খালের উপর দিয়ে বেহুলা নৌকা নিয়ে যাওয়ার সময় একদিন হঠাৎ নৌকা ডুবে যায়। নৌকা আর তুলতে না পারায় ঐভাবে থেকে যায়। পরে এটি মাটির আকৃতিতে পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বারুহাস ইমামবাড়া

চিত্র : ৩২-৩৩ ভূমির নকশা: ১২-১৩

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলা সদর হতে প্রায় ১২ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে বারুহাস গ্রামে এই ইমামবাড়া দু'টি অবস্থিত।

বর্ণনা : দোচালা এই ইমারত দুটির প্রথমটির পরিমাপ ৩ মিটার × ১.৯০ মিটার এবং উচ্চতা ৪.১৫ মিটার। দেওয়াল .৪৫ মিটার প্রশস্ত। প্রবেশ পথের উচ্চতা ১.৩০ মিটার। প্রবেশ পথটি খিলান যুক্ত। প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বেই স্টাকো নকশায় জীবজন্তুর মূর্তি অংকিত ছিল।

দ্বিতীয় ইমামবাড়ার পরিমাপ ৪.৪৫ মিটার × ২.৪৫ মিটার। দেওয়াল .৪৫ মিটার প্রশস্ত। প্রবেশ পথের উচ্চতা ১.৪০ মিটার। এখানেও প্রবেশ পথটি খিলানযুক্ত এবং উভয় পার্শ্বে স্টাকো অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায়। অভ্যন্তর দেয়ালে দুটি কুলুঙ্গী রয়েছে।

ইমারত দুটির বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয়। এখানে আচ্ছাদনে দোচালা রীতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইমারত দুটির নিকটে একটি মসজিদ ছিল যা বর্তমানে নেই। মুসলিম শিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত বিশেষ ধরণের স্থাপত্যকে ইমামবাড়া বলে অভিহিত করা হয়। শিয়া সম্প্রদায় এদেশে কারবালার নিষ্ঠুর ঘটনাটির স্মৃতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে ইমামবাড়া নির্মাণ করেন। ইমামবাড়া দুটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে, শিয়া মতাবলম্বী প্রজাদের দ্বারা সতের শতকে বারুহাসে ইমামবাড়া নির্মাণ করা হয়েছিল।[২]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে উল্লেখ্য যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৫২৮ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য চলনবিলের বারুহাস গ্রামে আসেন এবং শাহ ইমামের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। শাহ ইমাম সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তখন সম্রাট জাহাঙ্গীর সেখানে একটি মসজিদ শাহ ইমামের ইবাদতের জন্য কয়েকটি পাকা কক্ষ ও একটি পুকুর খনন করার ব্যবস্থা করেন। অতএব নিদর্শনগুলি সতের শতকের নির্মাণ বলে ধরা যায়। ঘটনাটির ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। [৩]

বস্তুল শিববাড়ি

চিত্র : ৩৪

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলা সদর হতে প্রায় ৬.৫০ কি. মি. উত্তরে বারুহাস ইউনিয়নের বস্তুল প্রাইমারী ও হাইস্কুলের উত্তরে এক বিঘা জমির উপর এই শিব বাড়িটি অবস্থিত।

বর্ণনা : আয়তাকার উচু ঢিবির উপর নির্মিত বস্তুল শিব বাড়িটির কোন চিহ্ন বর্তমানে আর অবশিষ্ট নেই। অসংখ্য বটবৃক্ষে ঘেরা এই শিব বাড়িটিতে বর্তমানে একটি শিব লিংগ আছে। তাছাড়া ইট পাথরের ছোট ছোট অনেক টুকরো ছড়িয়ে আছে। এখানে পূর্বে একটি শিব মন্দির ছিল। মন্দিরে একটি শিব মূর্তিও ছিল। ধ্বংস হওয়ার পর মূর্তিটিও হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে পাথরটিকে বটগাছের নিচে রেখে স্থানীয় জনগণ পূজা করে। স্থানীয় কাহিনী অনুসারে এখানে বেহুলার বাপের বাড়ি ছিল। এই ঢিবির চারিদিকে ঘিরে পূর্বে পরিখা ছিল তার অস্তিত্ব বোঝা যায়। বর্তমানে এখানে অধিকাংশ এলাকা জুড়ে চাষাবাদের প্রয়োজনে ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর ধ্বংসাবশেষ উঠিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে বস্তুল শিববাড়ির প্রাচীনত্ব বোঝার মতো অতিসামান্যই বিদ্যমান আছে।

Dhaka University Institutional Repository

সন্ন্যাসীর ভিটা

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলার বারুহাস ইউনিয়নের বিনোদপুর গ্রামে সন্ন্যাসীদের ভিটা অবস্থিত।

বর্ণনা : ৪০ মি. দৈর্ঘ্য এবং ৩০ মি. প্রস্থ এই ঢিবিটির উচ্চতা প্রায় দুই মিটার। স্থানীয় জনসাধারণ এই ঢিবিকে সন্ন্যাসীর ভিটা বা বৈষ্ণবচরণের ভিটা নামেও পরিচিত। এই ঢিবিটি চলন বিলের সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের অন্যতম আখড়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে ভিটার উত্তর-পশ্চিম কোনে পুকুরের পাড়ে বটগাছের শিকড় দ্বারা আবৃত ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি মঠের অস্তিত্ব এখনো বর্তমান। এসব ধ্বংসাবশেষ এই স্থানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রমাণ করে।

বিবির বাংলা

চিত্র : ৩৫

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলার বারুহাস ইউনিয়নের কুসুম্বী গ্রামে বিবির বাংলা নামে একটি বাংলার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়।

বর্ণনা : বাংলাটির পশ্চিম দিকের ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীর এখনো টিকে আছে। এই প্রাচীরটির উচ্চতা চার মিটার এবং ভেতরের অংশের পরিমান ৩ মিটার × ২.৫০ মিটার। দেয়াল গাত্রে ইটের নকশা পরিলক্ষিত হয়। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে শাহ জামাল ও শাহ কামাল নামে দুই ভাই তাঁদের নিজেদের এবাদতের জন্য ভবনটি নির্মাণ করেছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং কক্ষটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল বলে স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়।[৪] তবে বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই ইমারতটির কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই।

তাড়াশ রাজবাড়ি

চিত্র : ৩৬

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলা সদরে র্গালস হাই স্কুলের নিকটে তাড়াশ রাজবাড়ি অবস্থিত।

বর্ণনা : ধ্বংসপ্রাপ্ত এই রাজবাড়ির উত্তর দিকে ক্ষুদ্র ইটের তৈরী এক টুকরো দেয়াল লক্ষ্য করা যায়। রাজবাড়ির আর কোন চিহ্ন বর্তমানে টিকে নেই। অবিভক্ত পাবনা জেলার সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমিদার হলেন তাড়াশের জমিদারগণ। তাদের আদি নিবাস ছিল তাড়াশের অদূরে অবস্থিত চড়িয়া গ্রামে। তাড়াশ জমিদারদের পূর্ব পুরুষ নাটোররাজের অধীনে দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাড়াশ জমিদারির প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব তালুকদার নবাব মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ববিভাগে চাকুরী করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং নবাব কর্তৃক রায় চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত হন। তাড়াশের জমিদারদের মধ্যে বনওয়ালীলাল রায় ও তার পুত্র বনমালী রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরা পাবনা জেলার শিক্ষা বিস্তারে বহু অর্থ দান করেন ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বনমালী রায় পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলায় অবস্থিত রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। এছাড়া পাবনা জেলা শহরে তাড়াশ জমিদারদের নির্মিত আর একটি ভবন রয়েছে। এটি তাড়াশ বিল্ডিং বা তাড়াশ রাজবাড়ি নামেও পরিচিত।

তাড়াশ জমিদারদের একটি বংশ তালিকা নিম্নে দেওয়া হল:

Dhaka University Institutional Repository

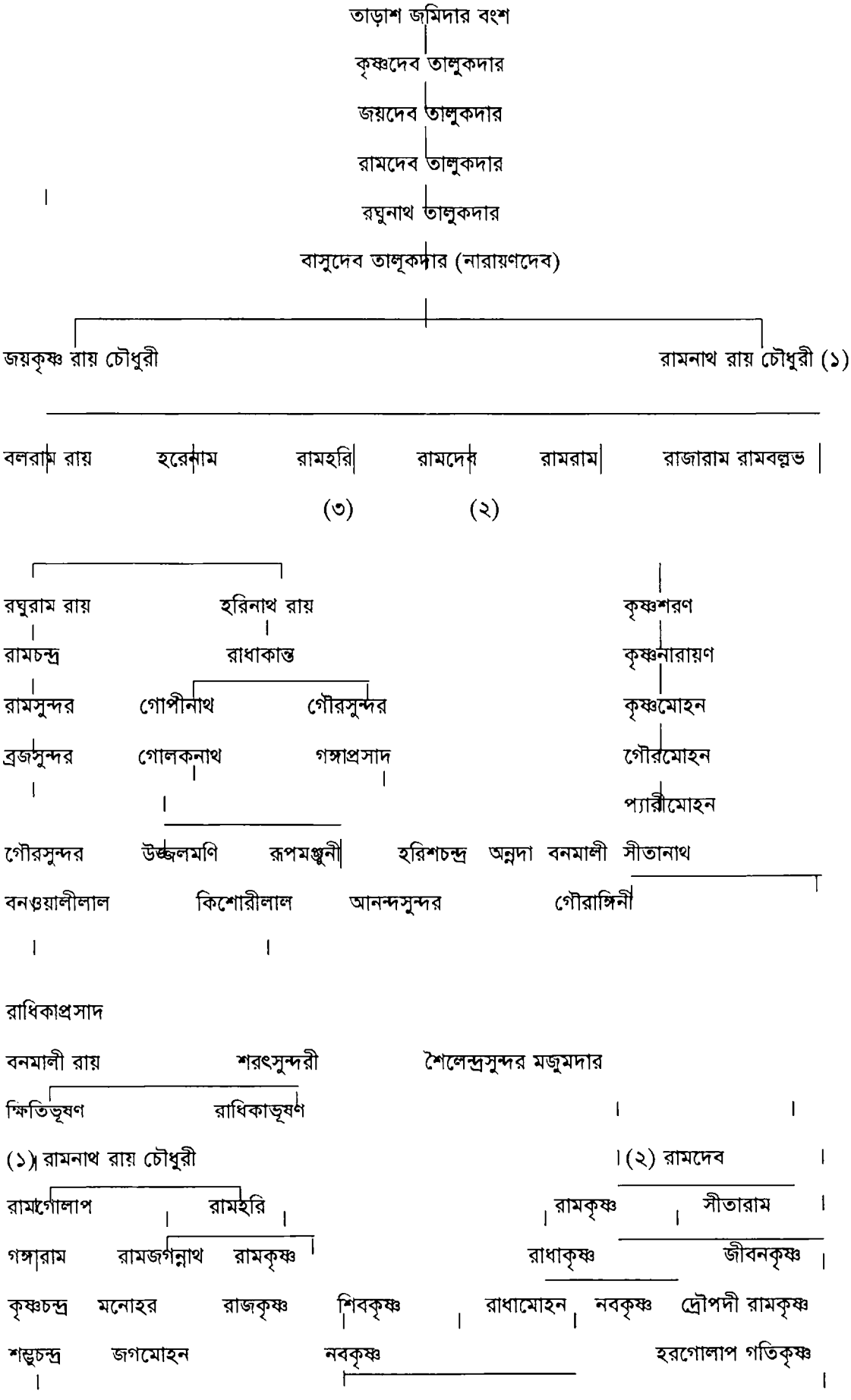

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বরচন্দ্র হরমোহর কৃষ্ণকুমার ব্রজকুমার রাজকুমার অবিনাশ

সতীশচন্দ্র ভূবনমোহন ব্রজলাল

হেমচন্দ্র চৌধুরী

(৩) রামহরি

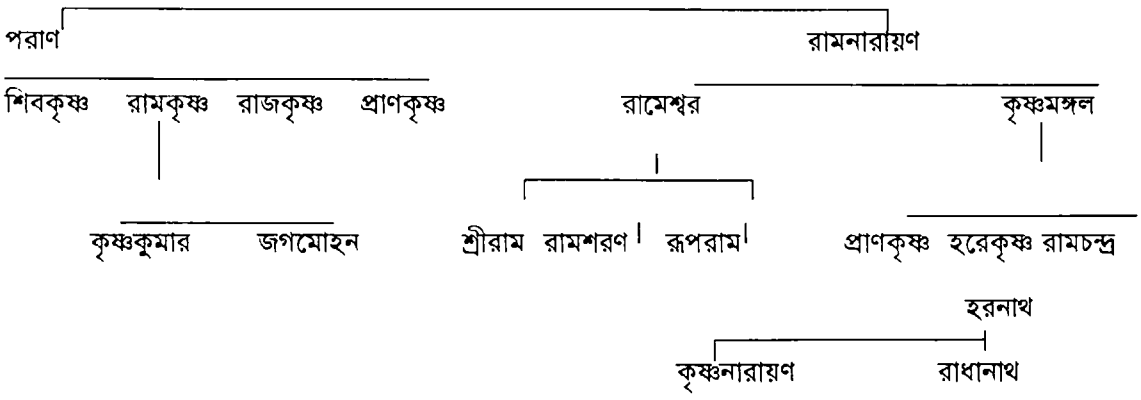

Dhaka University Institutional Repository

রঙ্গমহল

চিত্র : ৩৭

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ বাজারের ১ কি.মি. উত্তর পশ্চিমে রঙ্গমহল নামে একটি জলাশয় অবস্থিত।

বর্ণনা : জলাশয়টির উত্তর- পূর্ব কোনে কিছুদিন আগে মাটির নিচ থেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের স্তুপীকৃত ইটের দেখা পাওয়া যায়। এখন এসব ইট আর নেই। অনুমিত হয় এখানে রঙ্গমহল নামে পূর্বে একটি ভবন ছিল যার কেবল নামটি রয়ে গেছে। বর্তমানে স্থানীয়ভাবে স্থানটি 'রংমহল' নামে অভিহিত। অনুমিত হয় 'রংমহল' রঙ্গমহল শব্দেরই পরিবর্তিত রূপ।[৫]

ভান সিংহের দীঘি

চিত্র : ৩৮

বর্ণনা : নওগাঁ শাহী মসজিদের উত্তর পশ্চিম কোণে ভান সিংহের দীঘি নামে আরেকটি বড় দীঘি আছে। এ দীঘিটির মধ্যে একটি জলটুঙ্গি আছে।[৬] অন্যতম বৃহৎ আরেকটি জলাশয় এখনো রয়েছে যার নাম মথুরা'।[৭] অনুমিত হয় ভানসিংহের পূর্ব পুরুষ মথুরানাথ রায় এ জলাশয়টি খনন করেছিলেন। ভান সিংহ ছিলেন রাজা মানসিংহের ভ্রাতা। প্রায় এক মাইল বিস্তৃত ইট নির্মিত রাজবর্ত্ম ভান সিংহের রাস্তা বা জাঙ্গাল নামে খ্যাত। এসব কীর্তি এ কথাই প্রমাণ করে যে, এককালে এ অঞ্চলে হিন্দু মুসলিম উভয়েই স্থাপত্য ঐতিহ্যে অবদান রেখে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নওগাঁ শিবলিঙ্গ

চিত্র : ৩৯

অবস্থান : তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ বাজারের পূর্ব প্রান্তে এই শিব লিঙ্গটি অবস্থিত।

বর্ণনা : মিটার উঁচু ইটের প্রাচীরের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে একটি শিব লিংগ আছে। ধারণা করা হয় এ শিব লিঙ্গটি নওগাঁ শিব মন্দিরের। তবে মন্দিরের কোন অস্তিত্ব নেই। এ শিব লিঙ্গটি কাল ব্যাসাল্ট পাথরে নির্মিত এবং আকৃতিতে বৃহৎ এবং উচ্চতায় প্রায় ১.২৫ মি.। অদ্যাবধি স্থানীয় জনসাধারণ এখানে পূজা করে থাকে।

রাণীর জাঙ্গালের সেতু

চিত্র : ৪০-৪১

অবস্থান : শেরপুর-সিংড়া সড়কের রাণীর হাট বাজারের পশ্চিমে ভীমের জাঙ্গালের বা রাণীর জাঙ্গালের কাছে এ সেতুটি অবস্থিত।

বর্ণনা : মুঘল বৈশিষ্ট্য নির্মিত এ সেতুটির দৈর্ঘ্য ২১.৯৪ মিটার, প্রস্থ ৯.৭৫ মিটার ও উচ্চতা ৪.০৪ মিটার। তিনটি চতুর্কেন্দ্রিক খিলানের সাহায্যে ইট, বালি, চুন সুরকি দিয়ে এই সেতুটি নির্মিত। ১৯ শতকের প্রথম দিকে রানী ভবানী কর্তৃক এই সেতুটি নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে এই সেতুর পূর্ব দিকের অংশ ভেঙ্গে গেছে। যাতায়াতের জন্য পাশে একটি বেইলী ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আয়শা বেগম, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২, পৃ. ২২৬।

২. *ঐ*, পৃ. ২২৬।

৩. *ঐ, পৃ. ২২৬।*

৪. বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮।

৫. মোঃ হারুন অর রশিদ, *নওগাঁর ইতিকথা*, সিরাজগঞ্জ ; রশিদুন নেছা, ১৩৯৯ বাংলা, পৃ. ৩৬।

৬. রশিদ, *নওগাঁর ইতিকথা*, পৃ. ৩৪।

৭. *ঐ*, পৃ. ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

বর্তমান তাড়াশ থানাটি পূর্বে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্ভূক্ত ছিল। মৌর্যযুগ থেকে মুসলিম যুগ পর্যন্ত সময়ের উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত ১৪৭টি প্রত্নস্থলের মধ্যে রায়গঞ্জের নিমগাছি একটি প্রত্নস্থল। নিমগাছি গ্রামকে কেন্দ্র করে উত্তরে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রায় ১৫৫.৫২ বর্গ কি.মি. স্থান জুড়ে অসংখ্য প্রাচীনকীর্তির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এর পাশে আজও প্রাচীন করতোয়া নদীর একটি পরিত্যক্ত খাতের চিহ্ন বিদ্যমান। এখানকার শুষ্ক করতোয়া নদীর তীরে প্রাচীনকালে নিমগাছিতে বিরাট জনপদ গড়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা যায়। এখানে এই অঞ্চলে বহু প্রাচীন দিঘি ও টিবি বিদ্যমান রয়েছে। এই সমস্ত টিবি হতে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু গুলো বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগের বলে মনে হয়। তাছাড়া প্রাচীন বৃক্ষ, অজস্র ইট পাথরের টুকরো ও ভাঙ্গা পাত্রের খণ্ড এখানে পাওয়া যায়। এখানে গুপ্ত যুগের একটি মুদ্রা ও পোড়ামাটির চিত্রফলক প্রাপ্তির উল্লেখ রয়েছে।[১] এই প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত গুপ্ত আমলের পোড়ামাটির ফলক ও মুদ্রা আবিষ্কারের কথাও স্থানীয় জনগণের নিকট হতে জানা যায়।[২] এখান থেকে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি হতে 'পাহিলা' নামে উত্তরবঙ্গে ভট্টলা মন্ডলের একজন প্রশাসকের নাম পাওয়া যায়। এতে প্রাপ্ত পুন্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত একটি প্রশাসনিক (মন্ডল) এলাকার খোঁজ পাওয়া যায় যা পাল আমলের প্রশাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য।[৩] দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, এই অঞ্চলটি (বৃহত্তম পাবনা) পুন্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গের অর্ন্তগত যা বঙ্গের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। একাদশ শতকে উত্তরবঙ্গ কৈবর্ত অধিকারে আসে। রামপালের রাজত্বকালে নায়কভীম চলনবিলের উত্তর সীমান্তে ও সিরাজগঞ্জ থেকে শেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মৃত্তিকা প্রাকার নির্মাণ করে যা এখানো ভীমের জাঙ্গাল নামে পরিচিত।[৪] ভ্যানডেন ব্রুকের মানচিত্রে পাবনা জেলার হান্ডিয়াল ও তাড়াশের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে বগুড়ায় শেরপুর পর্যন্ত এবং আরো উত্তর অভিমুখে বিস্তৃত

Dhaka University Institutional Repository

রাস্তাকেই ভীমের জাঙ্গালের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এছাড়া তাড়াশ উপজেলার মাধাইনগর গ্রাম হতে লক্ষণসেনের সময়কার একটি তাম্র শাসনও পাওয়া গেছে। এই সমস্ত প্রাচীন প্রত্ন নির্দশন প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে।

তাড়াশে প্রাপ্ত স্থাপত্যের মধ্যে বেহুলার কূপ ও বেহুলার ভিটা এই প্রত্ননিদর্শন দুটি সর্বপ্রাচীন বলে ধারণা করা হয়। তবে এখন পর্যন্ত এর প্রাচীনত্বের প্রমাণ স্বরূপ কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। বেহুলার কূপ ও বেহুলার ভিটা এই দুটি প্রত্নস্থলের সঙ্গে প্রাচীন যুগের একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে বিষয়টি পরবর্তী গবেষণার জন্য উন্মুক্ত রইলো।

১২০৪ সালে বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় মুসলিম আমলে তাড়াশে প্রাপ্ত ইমারতগুলির মধ্যে সর্ব প্রাচীন ইমারত হলো তাড়াশের ভাংগা বা ভাগনের মসজিদ। এ মসজিদ থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে 'খিত্তা' সিমলাবাদের নাম পাওয়া যায়।[৫] এ. বি. এম. হোসেন গৌড় থেকে খুলনা পর্যন্ত সুলতানি আমলের বেশ কয়েকটি শহরের নাম উল্লেখ করেছেন যে গুলোকে তিনি একটি বিভাগীয় শহর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, এই শহরগুলো হলো- গৌড়, লখনৌতি, বাঘা, বারোবাজার এবং খলিফাতাবাদ। এরা প্রত্যেকে প্রায় শত কি.মি. দুরত্বে অবস্থিত।[৬] ইয়াকুব আলী পাবনার উত্তর প্রান্তের অংশ বিশেষ, বগুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম এবং রাজশাহীর পূর্ব-দক্ষিণ ভূ-ভাগকে 'খিত্তা' সিমলাবাদের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর নবগ্রাম বা নওগাঁ নতুন মুসলিম অধ্যুষিত শহর হিসেবে গড়ে উঠে এবং নবগ্রাম শিলালিপিতে উৎকীর্ণ 'খিত্তা' (প্রাকার বেষ্টিত সুরক্ষিত নগর) সিমলাবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৭] সম্প্রতি গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়ে তাড়াশের অন্তর্ভূক্ত নবগ্রাম সম্ভবত মাহমুদাবাদের ভৌগোলিক সীমারেখার

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং পাবনার দক্ষিণে বিস্তৃত এলাকা মাহমুদাবাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে ধারণা করায় প্রতীয়মান হয় যে, পাবনার দক্ষিণে এবং সরকার বাজুহার অন্তর্গত ইউসুফশাহী পরগণাটি সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে মাহমুদাবাদ প্রশাসনিক অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৮]

দ্বিতীয় শিলালিপিযুক্ত মসজিদ নবগ্রাম শাহী মসজিদ। আব্দুল করীম এ শিলালিপিটির সঠিক পাঠ প্রদান করেছেন। এ শিলালিপিটি সুলতান নাসিরদ্দিন নুসরত শাহের সময়ের প্রাপ্ত একমাত্র শিলালিপি যাতে সরকারী পদবী ছিল জংদার, মীরবহর এবং নাজির। আব্দুল করিম তাঁর অনুবাদে প্রমাণ করেছেন যে, শিলালিপিতে উল্লেখিত জংদার একটি সরকারী পদবী এবং এর গুরুত্ব সাধারণ একজন যোদ্ধা অথবা সৈনিকের চেয়ে অনেক বেশি। সমকালীন কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অফিসারের মধ্যে জংদার ছিল একটি; মীরবহর অর্থ নৌ প্রধান, আর সুলতানি আমলে নাজির ছিলেন দিওয়ান-ই-উজারাত বা রাজস্ব বিভাগের একজন অফিসার। নবগ্রাম শিলালিপিতে নাজির পদের উপস্থিতি থেকে অনুমান করা যায় যে, সুলতানি আমলে বাংলায় নাজিরের কার্যাবলী ছিল ব্যাপক এবং তিনি সাধারণ কোন প্রহরী ছিলেন না। এই শিলালিপিটি পাবনা অঞ্চলে তথা সমগ্র বাংলায় একটি তারিখ যুক্ত প্রাচীন শিলালিপি।

শিলালিপি অনুসারে নুসরত শাহের সময়কালে অর্থাৎ সুলতানের শাসনের শেষ পর্যায়ে নির্মিত হলেও নবগ্রাম শাহী মসজিদে বাংলার প্রচলিত সুলতানি ও মুঘল উভয় যুগেরই স্থাপত্য শৈলীর কিছু ছাপ লক্ষ করা যায়। বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট বারান্দাযুক্ত এ মসজিদটি সুলতানি স্থাপত্য নিদর্শন; পরবর্তীতে যুগসন্ধিলগ্নে নির্মিত টাঙ্গাইলের আতিয়া জামে মসজিদটি (১৬১০-১৬১১ খ্রী) এ রীতির শেষ নির্দশন বলে উল্লেখ করা যায়। বর্গাকৃতির মসজিদের সম্মুখে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত বারান্দাযুক্ত ভূমি নকশাকে অনেকেই

Dhaka University Institutional Repository

উসমানীয় তুর্কি মসজিদের নকশা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উসমানীয় তুরস্কে প্রায় অনুরূপ নকশার মসজিদ নির্মিত হয়েছে; তবে নবগ্রাম শাহী মসজিদে এই নকশার ব্যবহারে বাংলার বাইরে কোন স্থাপত্যিক প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে বাংলার বারান্দার প্রয়োজনীয়তা সর্বজনবিদিত। গ্রাম বাংলার সাধারণ কুঁড়েঘরের সামনেও অনুরূপ বারান্দার লক্ষ করা যায়।[৯] আর সুলতানি আমলের মসজিদ স্থাপত্যে বাংলার এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই হয়ে আসছে। গোলাপগঞ্জের (দিনাজপুর ১৪৬০ খ্রি.) বারান্দাযুক্ত এক গম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের মসজিদ স্থাপত্যে সম্ভবত এ ধরণের মসজিদের প্রথম নমুনা এবং সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরত শাহের সময়েই এ ধরনের মসজিদ প্রথম লক্ষ করা যায়। এ ধরনের অন্যান্য মসজিদের মধ্যে সমাজ শাহী মসজিদ (১৫৫২ খ্রি.), লোটন মসজিদ, চামকাটি মসজিদ, খুনিয়াদিঘী মসজিদ (গৌড়) মসজিদ বাড়ি মসজিদ, দেওয়ানবাগ মসজিদ, হাজীগঞ্জ শাহী মসজিদ (নারায়নগঞ্জ) এর নাম করা যায়। অধ্যাপক এম. আর. তরফদার উল্লেখ করেছেন নবগ্রাম মসজিদটি ছিল বর্গাকার এক গম্বুজ বিশিষ্ট চার কোনে বর্গাকৃতির পার্শ্ববুরুজ সংবলিত।[১০] এবং লোটন মসজিদ ও গুমতি দরওয়াজাকে অনুসরণ করে এ মসজিদের ভূমি নকশা ও অলংকরণ রচিত হয়। স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ আহমদ হাসান দানিও মোটামুটি একই বর্ণনা দিয়েছেন।[১১] নবগ্রাম শাহী মসজিদে গোলাকার বুরুজগুলোর উপরে তুঘলক স্থাপত্যের প্রভাব অপেক্ষা আদিনা মসজিদ (১৩৭৫ খ্রি.) এর কোণে স্থাপিত গোলাকার বুরুজ এর প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। এ গোলাকৃতির বর্ডারযুক্ত বরুজ পরিকল্পনা এদেশের সাধারণ ঘরের বাঁশের খুঁটির ব্যবহারের রীতিকে অনুসরণ করে বাঁশের খুঁটির আদলে নির্মিত হয়েছে। এ মসজিদের বারান্দায় অবস্থিত দুটি প্রস্তর স্তম্ভ নানা কারণেই বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সুলতানি আমলের মসজিদে এরূপ অনুচ্ছ স্তম্ভের ব্যবহার এক অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য কিন্তু এ মসজিদের সম্মুখ বারান্দায় অবস্থিত স্তম্ভ দুটি

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মসজিদ স্থাপত্যে ব্যবহৃত সর্বোচ্চ স্ফীত আয়তনের। অষ্টকোণাকার এই স্ত ম্ভের ব্যাস ১.৮৩ মিটার (প্রায় ৬ ফুট)।

অবয়ব ও অলংকরণের দিক দিয়ে মসজিদটি সুলতানি আমলে নির্মিত লোটন মসজিদ ও গুমতি দরওয়াজার পার্শ্ববুরুজের নকশার ন্যায় নকশা সংবলিত। ঝুলন্ত দড়ির সাথে লকেটের নকশা, দেয়ালগাত্রে অতি সুন্দরভাবে চেনের সাথে ঝুলন্ত ফুলের নকশা নবগ্রাম শাহী মসজিদের প্যানেলের মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। এই নকশার উৎস প্রাক মুসলিম স্থাপত্য অলংকরণ বলে বিবেচিত হয়।

ধারণা করা যায় তাড়াশ অঞ্চলে সুলতানি আমলে করতোয়া নদীর তীরে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল যা নবগ্রাম নামেই অধিক পরিচিত ছিল। করতোয়া নদীর গতি পরিবর্তন হয়ে শুকিয়ে যাবার কারণে উক্ত জনপদটি বিস্তার লাভ করতে পারেনি। সম্ভবতঃ এই কারণেই সমগ্র মুঘল আমলে তাড়াশ অঞ্চলে নির্মিত কোন মসজিদের নির্দশন পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী কর্তৃক গৃহীত ভূমি সংক্রান্ত কিছু নীতি বিশেষ করে লর্ড কর্ণওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এর ফলে সমগ্র বাংলাতে বেশ কিছু নব্য জমিদার ও বিত্তশালী শ্রেণীর জন্ম দেয়। এই সমস্ত বিত্তশালী শ্রেণীর অর্থায়নে এই সময়ে বেশ কিছু মসজিদ তাড়াশ অঞ্চলে নির্মিত হয়েছে। সেগুলো হলো- বারুহাস জুমা মসজিদ, গদাই সরকার মসজিদ, সান্দুরিয়া জামে মসজিদ, ইসলামপুর জামে মসজিদ।

বারুহাস মসজিদটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে মুঘল স্থাপত্যরীতির অনুকরণে নির্মিত। লক্ষণীয় যে, এই মসজিদের প্রবেশ পথগুলোর খিলানের পাশাপাশি লিন্টেল বা সর্দলও ব্যবহৃত হয়েছে। আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ পরিকল্পনা মুঘল স্থাপত্য রীতির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রাক-মুঘল যুগ থেকেই এই পরিকল্পনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন গৌড়ের জাহানিয়া মসজিদ (১৫৩৫ খ্রি.) মুর্শিদাবাদের খেড়াউড়ে নির্মিত মসজিদ (১৫৯৪ খ্রি.)। তবে বগুড়া জেলার শেরপুরে নির্মিত খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২ খ্রি.) বারুহাস মসজিদের উপর এ রীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

গদাই সরকারের মসজিদটি ভূমি পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নির্মাণ কৌশল ও উপকরণ সব কিছুই ঐতিহ্যবাহী মুঘল রীতির অনুকরণে নির্মিত। তবে এ মসজিদটি মুঘল যুগের ঐতিহ্যের স্মৃতি সংরক্ষণের এক দুর্বল প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। চুন সুরকির নির্মিত দেয়াল, পলেস্তরা প্রক্ষেপিত স্ট্যাকো অলংকরণ এবং তাতে মারলন নকশার ব্যবহার স্পষ্টতই বাংলা মুঘল স্থাপত্যরীতির কথা মনে করিয়ে দেয়।

সিরাজগঞ্জ জেলায় মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেয়া যায় এ অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণ শুরু হয়েছে সুলতানি আমলে। শাহজাদপুর অবস্থিত মখদুম শাহদৌলা শহীদের মাজার সংলগ্ন মসজিদ, নবগ্রাম ভাঙ্গা মসজিদ, নবগ্রাম শাহী মসজিদের অবস্থানই প্রমাণ করে ষোড়শ শতকের পূর্বে এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতি এবং মুসলিম জনগোষ্ঠির আবির্ভাব ঘটে। মুঘল শাসনের অনেক পরে নির্মিত এ মসজিদটির আয়তন ও আকৃতি দেখে মনে হয় যেন ঐ সময় পর্যন্ত এখানে মুসলিম জনসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। মসজিদের অভ্যন্তরে স্বল্পায়ত পরিসর এবং কেবল এক সারি মুসুল্লী দাঁড়ানোর ব্যবস্থা সে রকমই ইঙ্গিত দেয়। এই ধারণার গ্রহণ করার মতো জোরালো কোন যুক্তি অবশ্যই নেই। মসজিদটি নির্মাণ শৈলীতে মুঘল স্থাপত্যের যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তা থেকে বরং এটাই অনুমতি হয় এগুলো ছিলো এ অঞ্চলে আগত কোন কর সংগ্রহের জন্য নির্মিত একান্ত ব্যক্তিগত প্রার্থনাগৃহ। পরবর্তী মুঘল যুগে (Late Medieval Mughal Period) বাংলার প্রত্যন্ত মুঘল প্রশাসনের চরিত্র ছিলো এ রকমই। কোনো মুঘল সম্রাট কিংবা যুবরাজই এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন নি। মুঘল অভিজাতরাও বাংলায়

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ী নিবাস গড়তে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। সাধারণ মুঘল সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রিয় প্রশাসনের প্রতিচ্ছবি। সুবাদার ইসলাম খানের সময় থেকে বাংলায় প্রাদেশিক প্রশাসনেও তার অনুকরণের প্রচেষ্টা চলেছে। রাজধানীতে রাজকীয় আড়ম্বরের সব আয়োজনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিন্তু মুঘল বাংলার তৃণমূল পর্যায়ের প্রশাসনে এই ধারা বজায় থাকে নি। এর একটি কারণ বাংলা অভিযানের শুরুতেই মুনিম খানের বিপর্যয়ের পর মুঘলরা বাংলায় বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেনি কখনো। শুধু তাই নয়, বাংলার স্থানীয় জনগণের সঙ্গেও তারা সুস্পষ্ট দুরত্ব রাখতো। সিরাজগঞ্জ গদাই সরকারের মসজিদ ছাড়াও কাজিপুর থানায় অবস্থিত বেরিপোটল মসজিদ, বিয়ারা মসজিদও আয়তনে ক্ষুদ্রাকারে নির্মিত। তিন শতাব্দি ধরে বাংলায় প্রচলিত পলেস্তারাবিহীন ভারি ইটের দেওয়াল, বক্রকর্ণিশ, ছাদ পর্যন্ত প্রলম্বিত পার্শ্ববুরুজ, দ্বিকেন্দ্রিক খিলান বিশিষ্ট নিচু প্রবেশ পথ, পিপাবিহীন অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ আর টেরাকোটা অলংকরণের পরিবর্তে এসব স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়েছে পলেস্তারা ঢাকা দেওয়াল, সমতল ছাদ, বন্ধ পাপড়ির নকশা শোভিত প্যারাপেট, ছাদ ছাড়িয়ে উপরে উঠে যাওয়া অপেক্ষাকৃত সরু পার্শ্ববুরুজ, কন্দাকৃতির গম্বুজ ও দেয়ালের গায়ে পলেস্তারা দিয়ে তৈরী খোপ নকশা অলংকরণ। এসব স্থাপত্যে যে নতুন নির্মাণরীতি ব্যবহৃত হয়েছে, তাই এরপর বাংলা স্থাপত্যে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রাচীনকালে এবং সুলতানি আমলের কোন মন্দির স্থাপত্য তাড়াশে পরিলক্ষিত হয় না। তাড়াশে প্রাপ্ত মন্দিরগুলি মুঘল ও ঔপনিবেশিক আমলে নির্মিত। দিল্লীতে মুঘল রাজশক্তির অবক্ষয়ের ফলে বাংলায় এক নব্য আমলা শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলোতে মুর্শিদকুলি খানের আত্মীয়বর্গকে নিয়োগ দান করা হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আমলাগণ, বিশেষভাবে রাজস্ব বিভাগের প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু এবং এদের বেশ কয়েকজনকে জমিদারি প্রদান করা হয়। বংশগত এ শক্তিধর ভূ-স্বামীরা যতকাল প্রাদেশিক সদর দপ্তরে নির্ধারিত রাজস্ব নিয়মিত পাঠাতেন ততকাল এদের প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের সুবিধাপ্রদান করা হত। ১৭১৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে মঞ্জুরকৃত ফররুখ

Dhaka University Institutional Repository

শিয়ারের ফরমানের পরবর্তীকালে বৃটিশ বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ সাধিত হয়। শীঘ্রই গজিয়ে উঠে পণ্য উৎপাদনকারী ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এক সম্পদশালী উদ্যোগী বণিক (বানিয়া) সম্প্রদায়। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নবাবী শাসনের অবক্ষয় ঘটলে এ নব্য বিত্তশালী বাঙালি সম্প্রদায় ভূমি ক্রয়ে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করে এবং জমিদার উপাধি লাভ করে। নির্মাতাদের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা ছাড়াও মন্দির নির্মাণের মধ্য দিয়ে তাদের দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয়।

সরকার, পরগণা বা চাকলার মতো প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোর প্রশাসনের দায়িত্ব পাওয়া বহিরাগত মুঘল সেনাপতিদের এই ধরণের মানসিকতা যেমন ছিল, তেমনি পাশাপাশি মুঘলরা রাজস্ব আদায়ের কাজে বাংলার স্থানীয় জমিদার শ্রেণীকেও কাজে লাগাতো। বিশেষ করে তাড়াশের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই স্থানীয় জমিদারেরাই ছিলেন প্রশাসনের প্রতিনিধি। রাষ্ট্রের আয়ের উৎস বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এসব এলাকায় জঙ্গল সাফ করে নতুন নতুন বসতি ও কর্ষণযোগ্য ভূমি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হতো। এ নতুন কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই নওয়ারা ও হিসাজাতের মতো নিষ্কর জমিদারি প্রথা চালু হয়েছিল। এ ধরনের জমিদারির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বাভাবিক কারণেই খোঁজা হতো এমন লোকদের সমাজে যাদের প্রভাব আছে। বিশেষ করে ধর্মীয় প্রভাব, কারণ সেটাই ছিল সবচেয়ে কার্যকর ও দীর্ঘস্থায়ী।

মন্দির স্থাপত্যে তাড়াশ অঞ্চলটি বেশ সমৃদ্ধ। এখানকার সর্বপ্রাচীন মন্দিরটি ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত কপিলেশ্বর (দক্ষিণ মুখী) শিব মন্দির। মন্দিরটি চারচালা মন্দিরের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলেও সূচালো অগ্র বিশিষ্ট এর চালা হান্ডিয়ালের জগন্নাথের মন্দিরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। অলংকরণেও জগন্নাথ মন্দিরের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, তাড়াশ অঞ্চলে মুঘল আমলে নির্মিত কোন মুসলিম ইমারত অদ্যাবধি

Dhaka University Institutional Repository

আবিস্কৃত হয়নি কিন্তু ১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত কপিলেশ্বর মন্দিরটি এই সময় এই অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রমান করে। তাড়াশের শিলালিপিযুক্ত পরবর্তী মন্দিরটি হলো রসিক রায়ের মন্দির। মন্দিরটি ১৬৪০ শকাব্দ অনুসারে ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। এটি দোলমঞ্চ বা রাসমঞ্চের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এর প্রবেশ পথে দোচালারীতির ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলিম আমলে বাংলা স্থাপত্যের দোচালা এবং চারচালা রীতি বেশ জনপ্রিয় ছিল। এর মধ্যে প্রবেশ পথে দোচালার ব্যবহার হিন্দু মুসলিম উভয় স্থাপত্যেই বহুল ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাড়াশের ছোট শিব মন্দির ও নওগাঁ শিবমন্দির (বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত) দুটি অষ্টকোনাকার এবং ওল্টানো পদ্মের উপর অষ্টকোনাকার গম্বুজ সহকারে নির্মিত। উল্লেখ্য মন্দির স্থাপত্যের এই রীতিটি অষ্টাদশ শতকে মুর্শিদাবাদে বিকাশ লাভ করে। সেই মোতাবেক মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকের আগের নির্মাণ নয়। ছোট শিব মন্দির অলংকরণে ছুটন্ত ঘোড়ার নকশা অলংকরণ রয়েছে। একই অলংকরণ কপিলেশ্বর ও হান্ডিয়ালের জগন্নাথ মন্দিরেও লক্ষ্য করা যায় যা থেকে এটি মন্দির স্থাপত্যে একটি জনপ্রিয় অলংকরণ হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

তাড়াশ থানায় প্রাপ্ত মন্দিরগুলিতে দু'ধরণের অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায়। (১) পোড়ামাটির চিত্রফলক (২) স্ট্যাকো নির্মিত অলংকরণ । এর মধ্যে পোড়ামাটির চিত্রফলক অষ্টমশতক বা তার পূর্ব থেকে পাহাড়পুর ময়নামতির বৌদ্ধমন্দিরগুলোর অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে। শিল্প নৈপুণ্য বিচারে এগুলো ছিল স্থূল অমার্জিত। তবে এদের বিষয়বস্তু ছিল বিচিত্র ও প্রাণবন্ত। ফলকগুলি আকারেও বড় ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এ শিল্প অস্বাভাবিক উৎকর্ষতা লাভ করে। কারণ এটি বাংলার একান্ত নিজস্ব শিল্প। যা যুগ যুগ ধরে পলিমাটির পটভূমিতে স্বাভাবিকভাবেই বিকাশ লাভ করেছিল বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। মধ্যযুগের পরিপুর্ণতার বিকাশে এসব পোড়ামাটি ফলকে কোন পৌরাণিক কাহিনী হোক বা ফুল লতা পাতার মোটিভ চিত্রনই হোক বহু ছোট ছোট অংশের সমন্বয়ে

Dhaka University Institutional Repository

এক একটি প্যানেলে কোন একটি বিষয়বস্তু অথবা কাহিনী অত্যন্ত নিপুনতার সঙ্গে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হাজারবছর পূর্বে বিচ্ছিন্ন স্থূল বিষয়বস্তুর আমূল পরিবর্তন ঘটেছে পরিপূর্ণতার যুগে যার নিদর্শন তাড়াশের কপিলেশ্বর মন্দিরে এখনো পরিলক্ষিত হয়।

রায়গঞ্জ থানার নিমগাছি থেকে প্রাপ্ত 'পাহিলা' শিলালিপি হতে জানা যায় যে, এই অঞ্চলটি অষ্টম শতকে পূন্ড্রবর্ধনভুক্তির একটি মন্ডল, ভট্টলা দেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে তাড়াশ থেকে প্রাপ্ত যে সমস্ত প্রত্নবস্তু সংরক্ষিত রয়েছে তাদের সময়কাল নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে বলে উল্লেখিত রয়েছে। এ সমস্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে বিভিন্ন দেব-দেবীর মুর্তি ছাড়াও ইমারতের ভগ্নাংশও রয়েছে। যা থেকে এ অঞ্চলে প্রস্তর ইমারত/মন্দিরের উপস্থিতি অনুমান করা যায়। তাড়াশের অনতিদূরে মাধাইনগর হতে লক্ষণসেনের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। তাম্রশাসন অনুযায়ী এটি লক্ষণসেনের রাজত্বকালের পঁচিশতম বছরে উৎকীর্ণ সেই মোতাবেক তাম্রশাসনটির উৎকীর্ণের তারিখ (১১৭৮+২৫)= ১২০৩ সাল। এই সমস্ত প্রত্নবস্তুর প্রাপ্তি ও লিখিত নির্দশন নিঃসন্দেহে হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে তাড়াশের গুরুত্ব প্রমাণ করে।

মুসলিম আমলেও তাড়াশ অঞ্চলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক হিসেবে পরিগণিত হত। ১৪১৪ সালে প্রাথমিক ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটিয়ে ভাতুরিয়া পরগণার রাজা গণেশ বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করেছিলেন। তার বংশধরগণ আঠাশ বৎসর বাংলা শাসন করে। তাড়াশ অঞ্চলটি এই সময়ে গণেশ শাসিত ভাতুরিয়া জমিদারির অংশ ছিল। ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস শাহের বংশধর নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ গণেশ বংশীয় শামসুদ্দিন আহমদ শাহকে হত্যা করে পুনরায় ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের শাসনামলে তাড়াশের নওগাঁ গ্রামে একটি সুবৃহৎ মসজিদ (একুশ গম্বুজ সম্বলিত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মসজিদে শিলালিপি পাঠে 'খিত্তা সিমলাবাদ' নামক একটি সুরক্ষিত শহরের উল্লেখ পাওয়া যায় যা নিঃসন্দেহে সুলতানী আমলের

Dhaka University Institutional Repository

প্রশাসনিক ইতিহাস পুনর্গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এটি এ সময়ে প্রশাসনিক একক হিসেবে এ অঞ্চলের গুরুত্বও প্রকাশ করে।

তাড়াশের নওগাঁয়ে নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের আমলে নির্মিত অপর একটি মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায় যা শিলালিপি থেকে মসজিদ নির্মাতার নাম আজায়েল মিয়া জংদার নাম পাওয়া যায়। যার পিতা ছিলেন একজন মীর-ই-বহর বা নৌ-বাহিনীর প্রধান। উক্ত শিলালিপি পাঠে এটুকু নিশ্চিত ভাবে বলা যায় নুসরত শাহের সময় কালে তাড়াশের নওগাঁ এক দিক দিয়ে যেমন সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হত তেমনি নৌঘাঁটি হিসেবেও এর গুরুত্ব ছিল। পরবর্তীকালে তাড়াশের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া করতোয়া নদীর খাতটি শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তাড়াশের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে যায় যার কারণে মুঘল শাসনামলে এই অঞ্চলে তেমন কোন ইমারতের নিদর্শন পাওয়া যায় না। মুঘল আমলের শেষের দিকে তাড়াশ জমিদারগণ এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং বিশাল জমিদারির পত্তন করেন। তাড়াশ জমিদারগণ কর্তৃক এই সময়ে তাড়াশে বহু মন্দির ও রাসমঞ্চ নির্মিত হয়। স্থাপত্যিক গুণ বিবেচনায় এ মন্দিরগুলো বাংলা স্থাপত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ১৮২৮ সালে পাবনা জেলা গঠনের পর তাড়াশ জমিদারগণ কর্তৃক পাবনা সদরে একটি রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আইন দ্বারা জমিদারির প্রথা বিলোপ সাধন করা হলে তাড়াশ অঞ্চলে জমিদারদের কার্যক্রমও স্তিমিত হয়ে আসে। সামগ্রিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, তাড়াশের ধর্মীয় ও ইহজাগতিক স্থাপত্য নিদর্শন আকর উৎস হিসেবে বাংলার রাজনৈতিক ও আর্থ সামাজিক ইতিহাস পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. আ কা মো যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা, শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ২২২।

২. মো. মোশারফ হোসেন, *প্রত্নতত্ত্ব: উদ্ভব ও বিকাশ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ২৯৫।

৩. সাইফুদ্দীন চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পা.) *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী, মুহ. মমতাজুর রহমান, ১৯৯৮, পৃ. ৭১।

৪. G Bhattacharya, "Bangladesh National Museum Prasasti of Pahila (9th contany)", *Journal of Bengal Art*, Dhaka, ICSBA, 1997. p. 112.

৫. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্ত লিখন শিল্প*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৩৫৬।

৬. ABM Husain, 'Baro Bazar; was it the Mahumadabad of Sultani Bangla?' P Hasan and M Islam (ed.), *Essays in Memory of Momtazur Rahman Tarafder*, Dhaka, Dhaka University, 1999, p. 229 - 236.

৭. ইয়াকুব আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৫।

৮. আয়শা বেগম, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, ঢাকা, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২, পৃ. ২৯০।

৯. *ঐ*, পৃ. ১৬৪।

১০. *ঐ*, পৃ. ১৬৪।

১১. A.H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca, Asiatic Society of Pakistan, 1961, p. 160.

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের মানচিত্রে সিরাজগঞ্জ জেলার অবস্থান

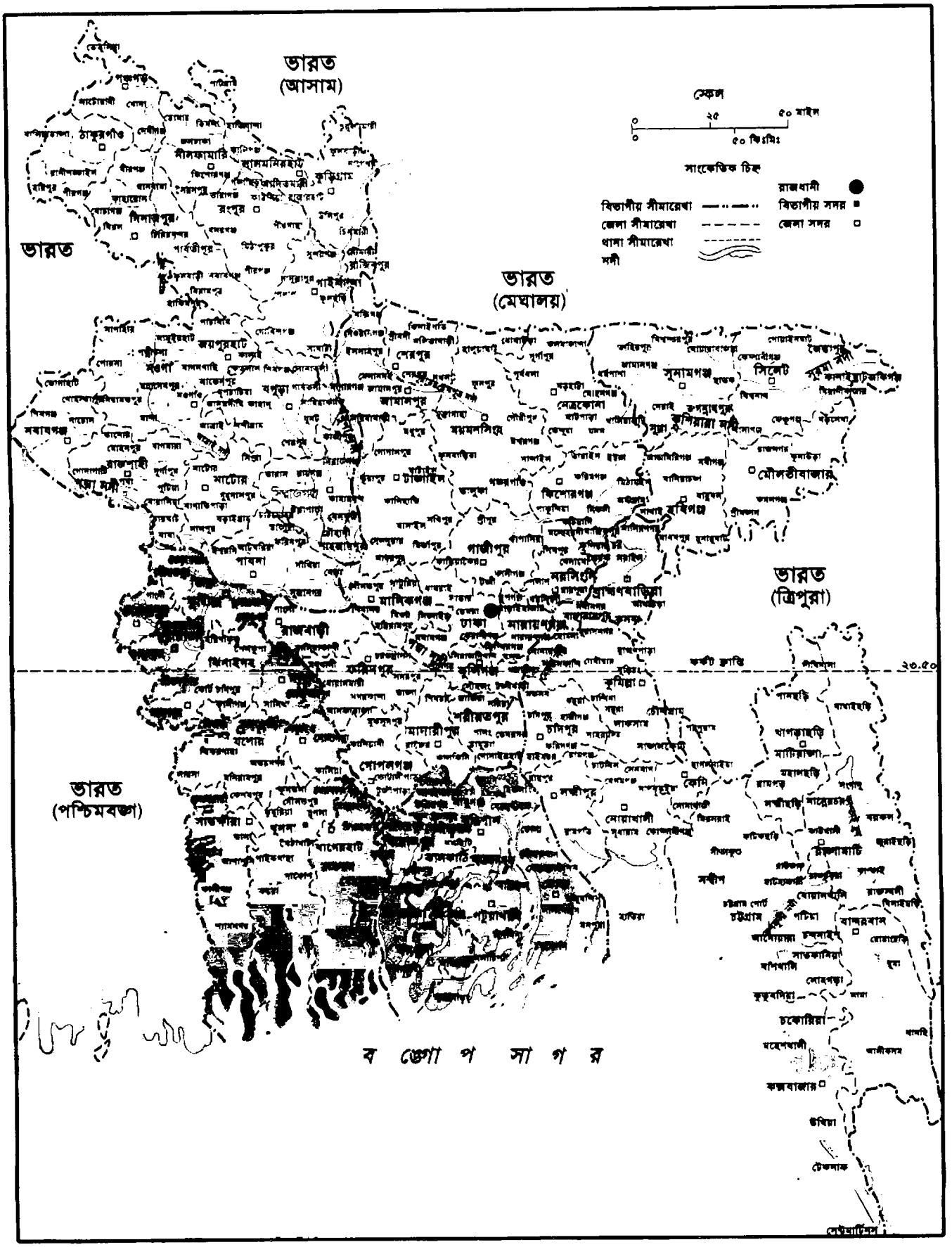

Dhaka University Institutional Repository

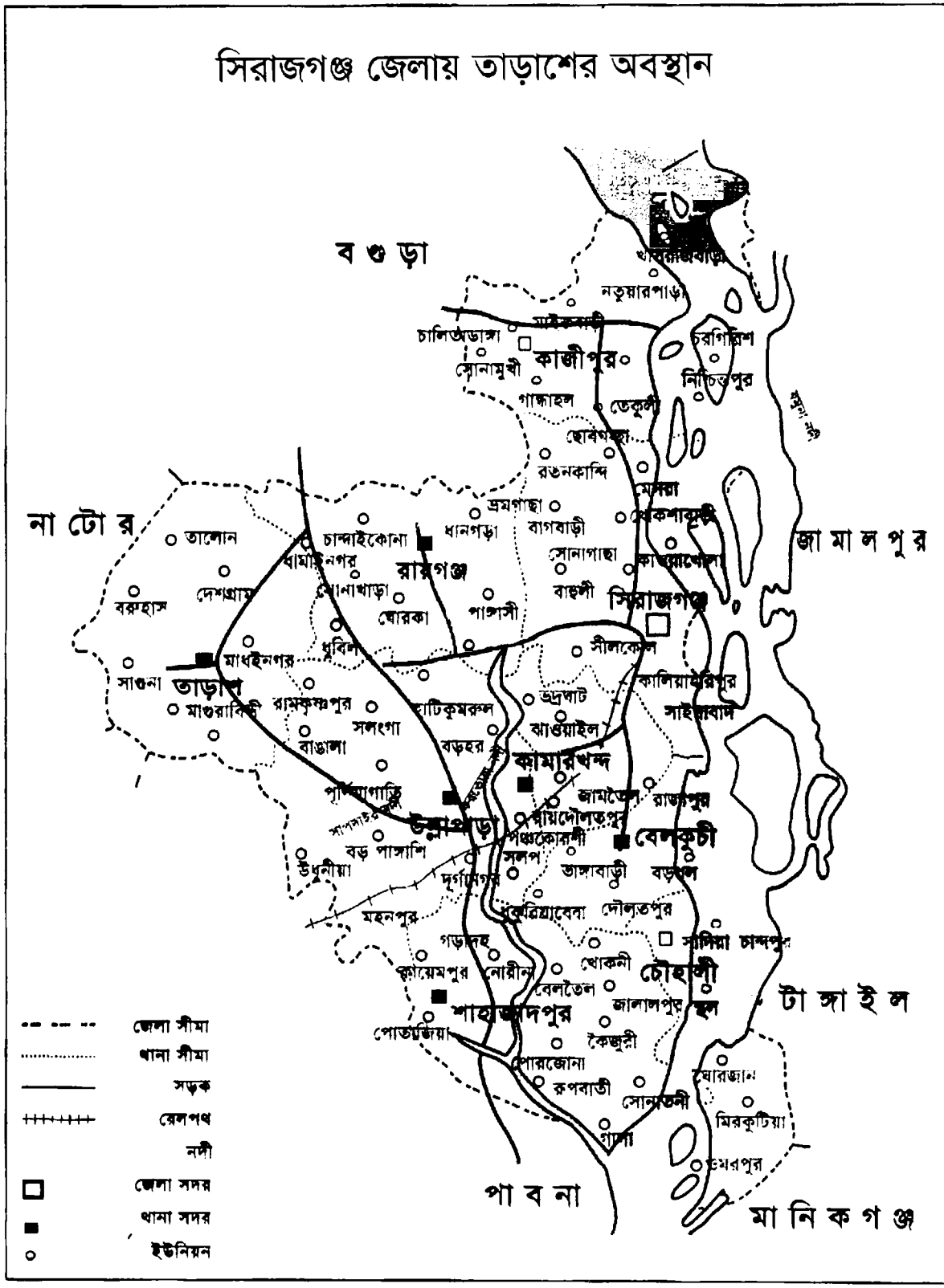

Dhaka University Institutional Repository

তাড়াশ উপজেলা

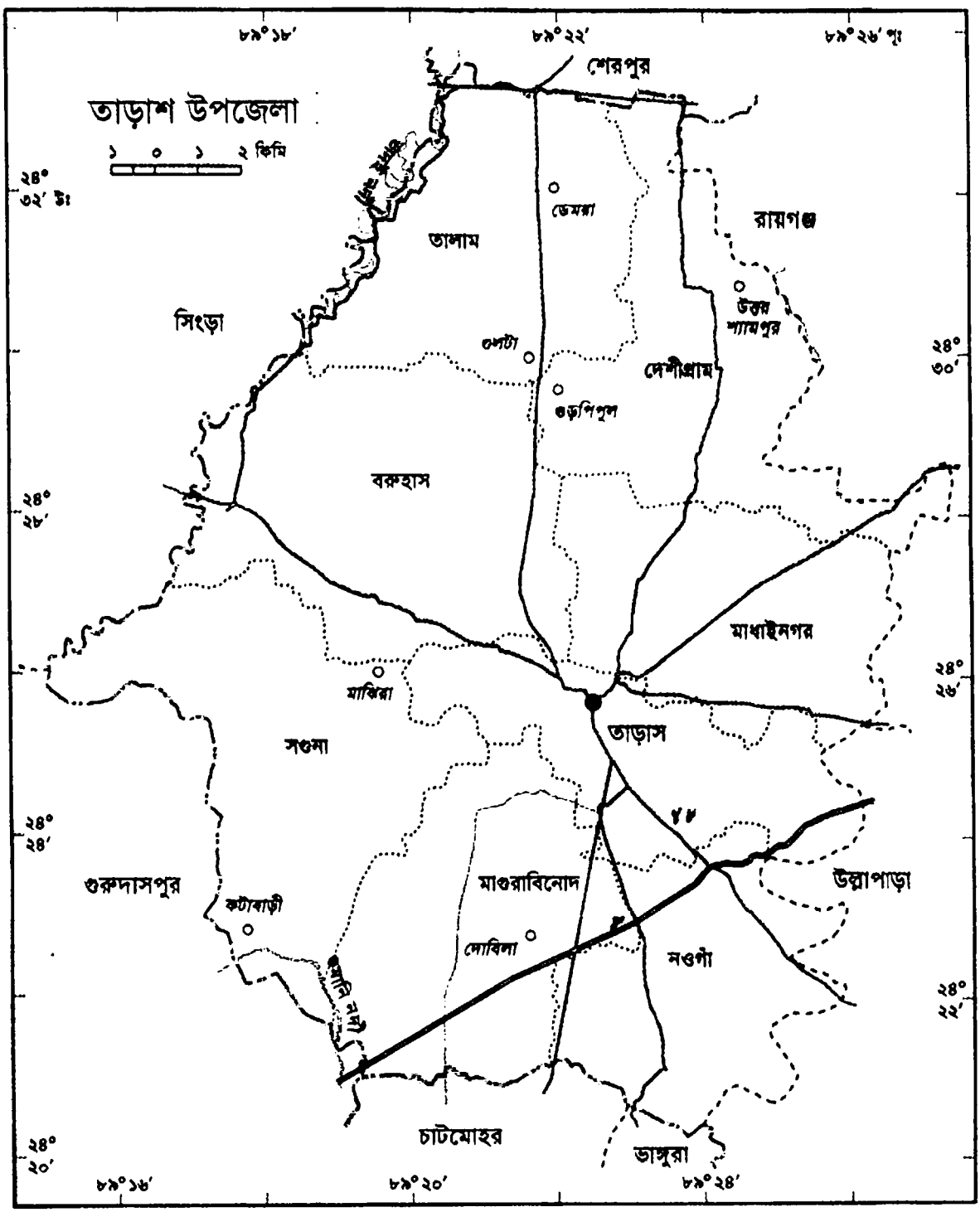

Dhaka University Institutional Repository

তাড়াশের স্থাপত্য নিদর্শন

নবগ্রাম তাপনের (ভাঙ্গা) মসজিদ
নবগ্রাম শাহী মসজিদ
গদাই সরকারের মসজিদ
সান্দুরিয়া জামে মসজিদ
বারুহাস মসজিদ
ইসলামপুর জামে মসজিদ
শাহ শরীফ জিন্দানির মাজার
তাড়াশ শিব মন্দির দক্ষিনমুখী
(কপিলেশ্বরী মন্দির)
তাড়াশ শিব মন্দির পশ্চিম মুখী
ছোট শিব মন্দির
গোবিন্দ মন্দির
রসিক রায়ের মন্দির
গোপাল বাড়ি মন্দির
বৃন্দাবন বিহারী মন্দির
নওগাঁ শিব মন্দির
সন্ন্যাসীর ভিটা
বস্তুল শিববাড়ি
তাড়াশের রায় বংশের জমিদার বাড়ি
বিন সারা বেহুলার কূপ
রংমেল ও তানসিংহের দিঘি ও অন্যান্য
ক. বারুহাস ইমাম বাড়া ১
খ বারুহাস ইমাম বাড়া ২
বিবির বাংলা
রানীর জাঙ্গলের সেতু

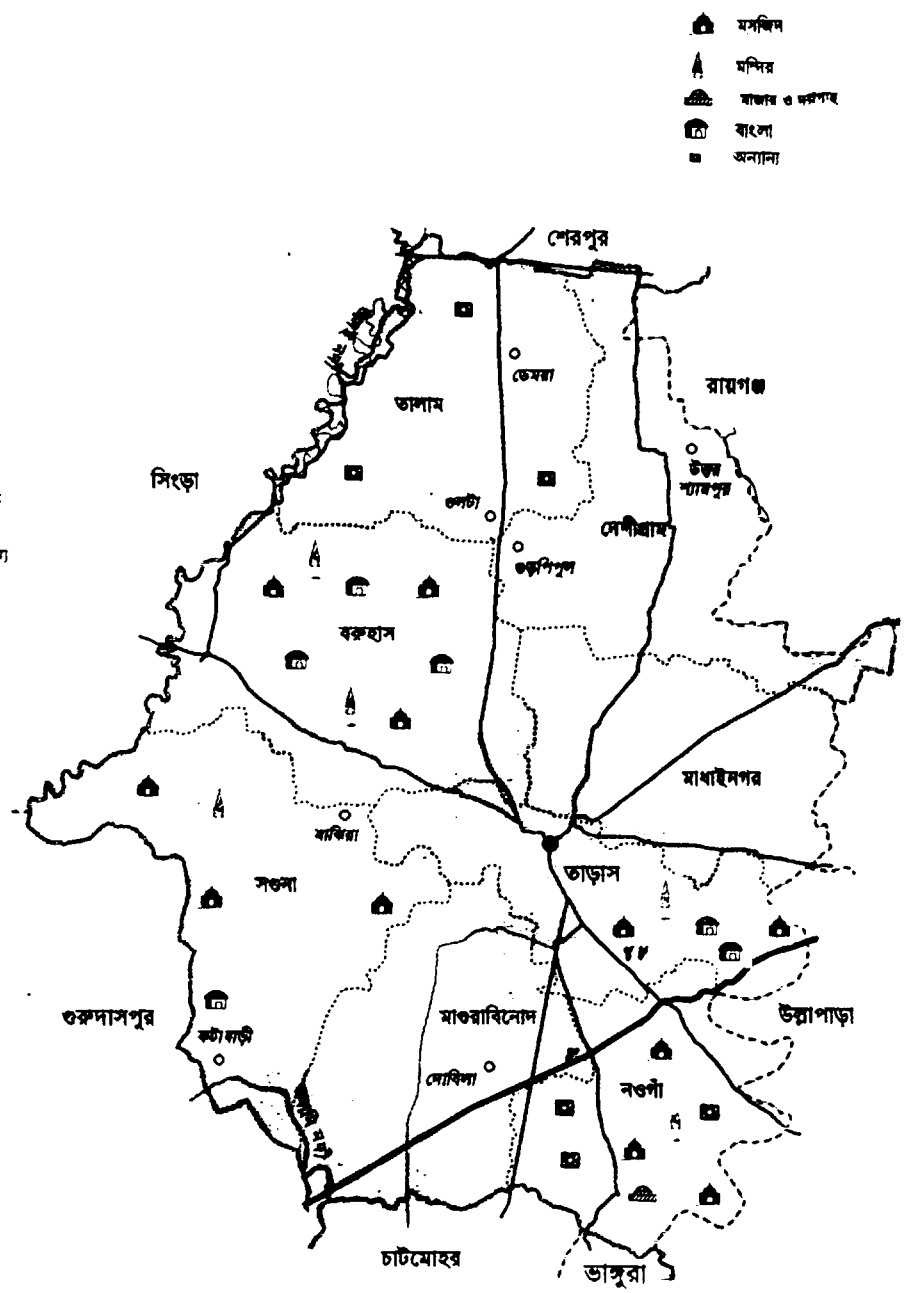

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি নকশা

Dhaka University Institutional Repository

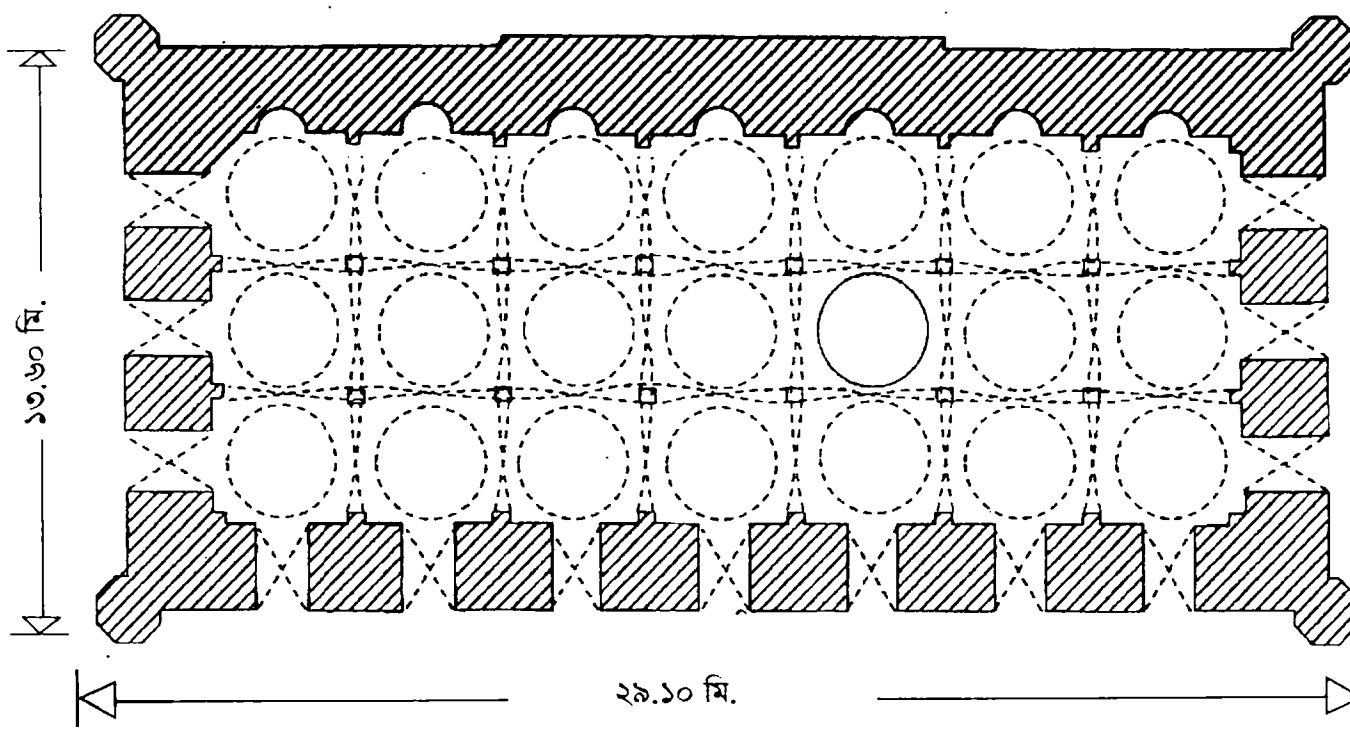

ভূমি নকশা : ১. নবগ্রাম ভাগনের মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

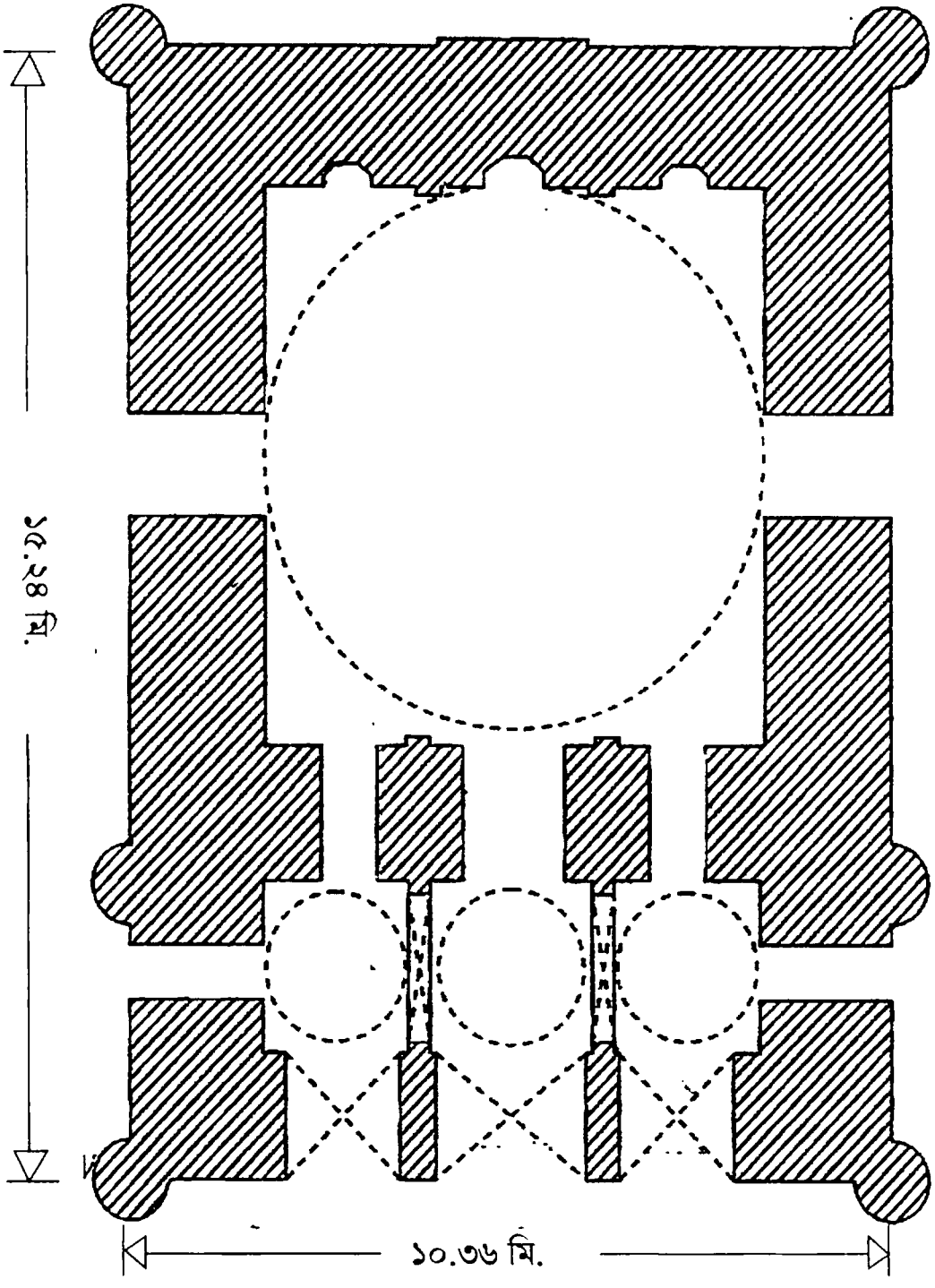

ভূমি নকশা : ২. নবগ্রাম শাহী মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

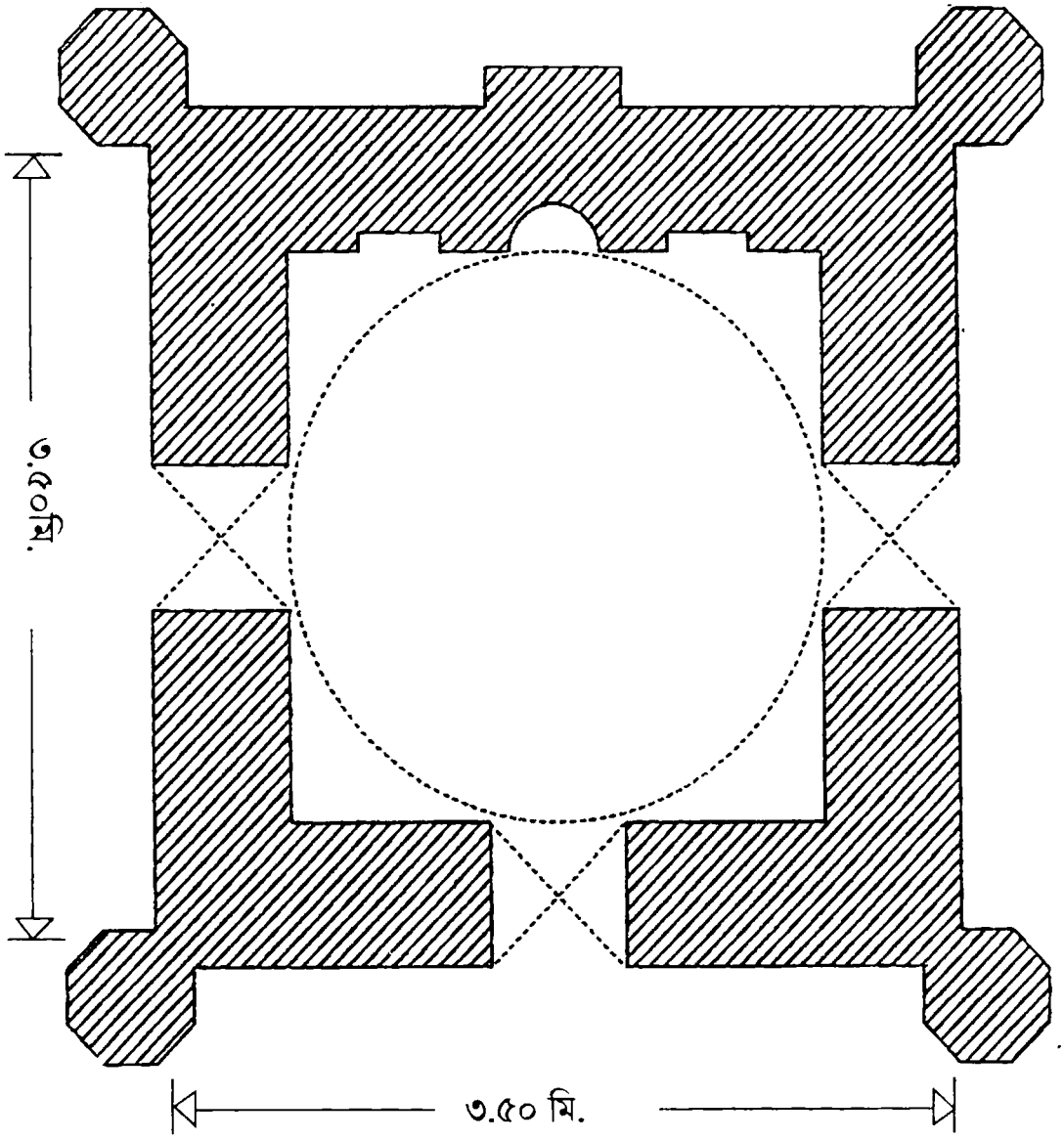

ভূমি নকশা : ৩. গদাই সরকারের মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

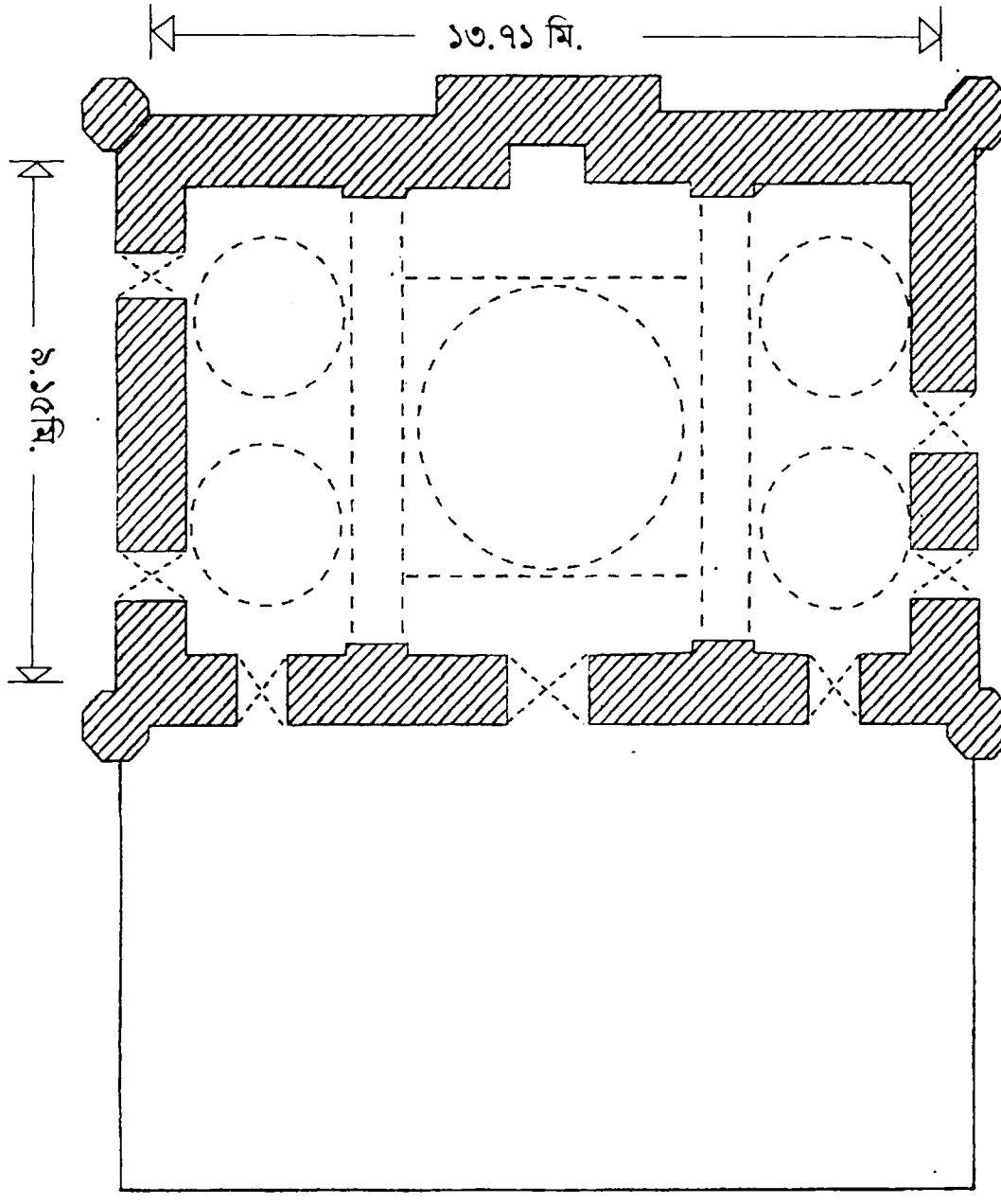

ভূমি নকশা : ৪. ইসলামপুর জামে মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

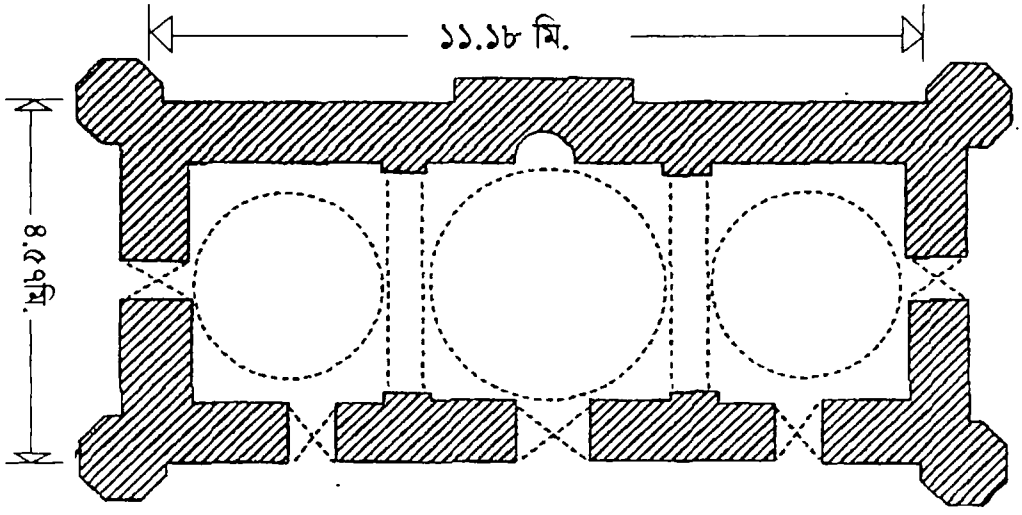

ভূমি নকশা : ৫. সান্দুরিয়া জামে মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

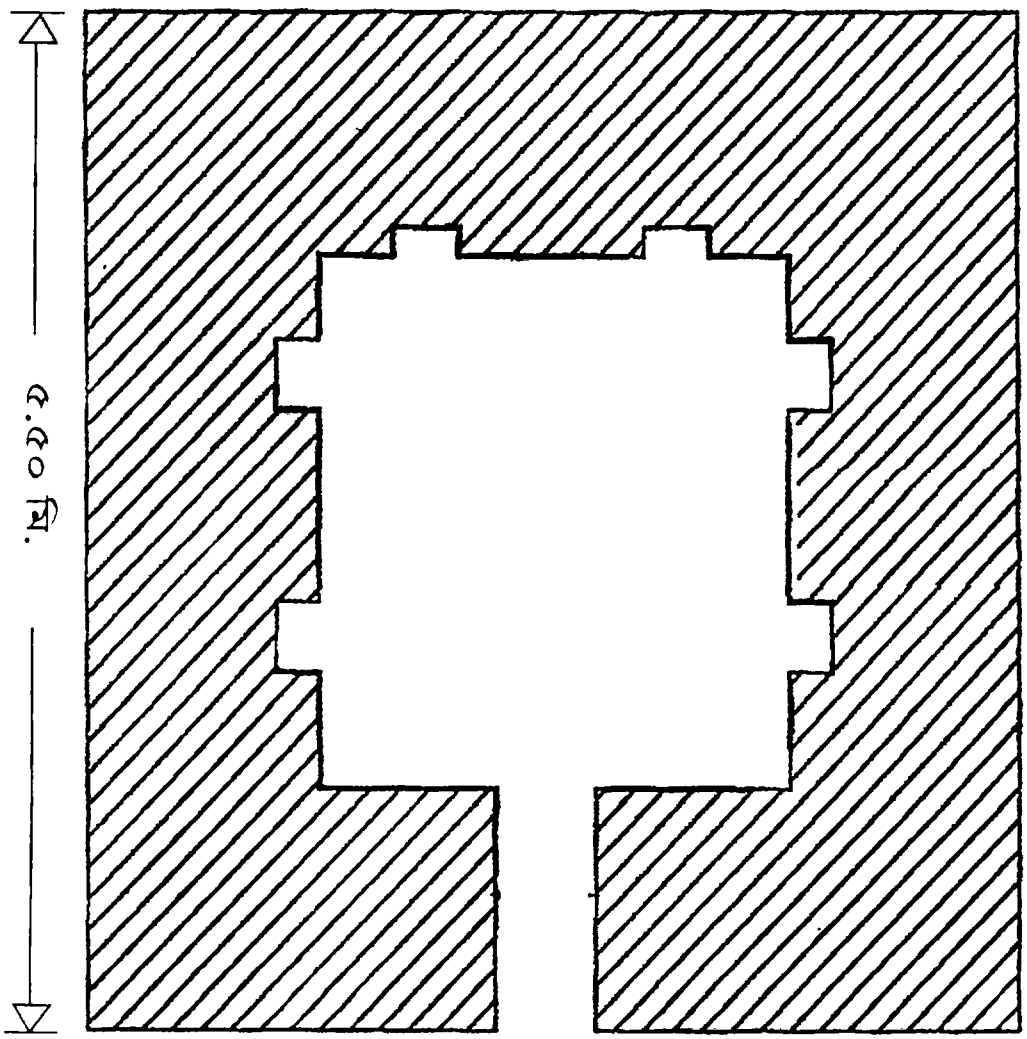

ভূমি নকশা : ৬. তাড়াশ শিবমন্দির, দক্ষিনমুখী (কপিলেশ্বর মন্দির)

Dhaka University Institutional Repository

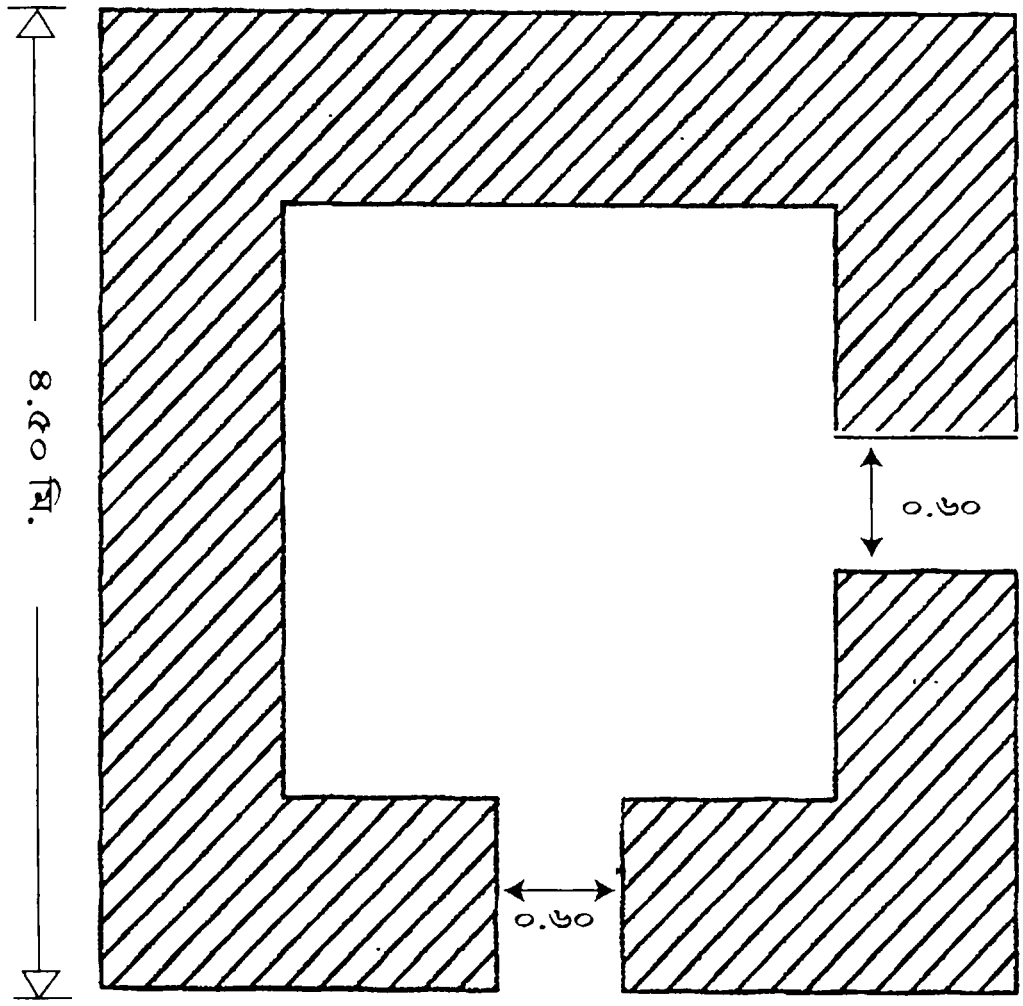

ভূমি নকশা : ৭. তাড়াশ শিবমন্দির, পশ্চিমমুখী।

Dhaka University Institutional Repository

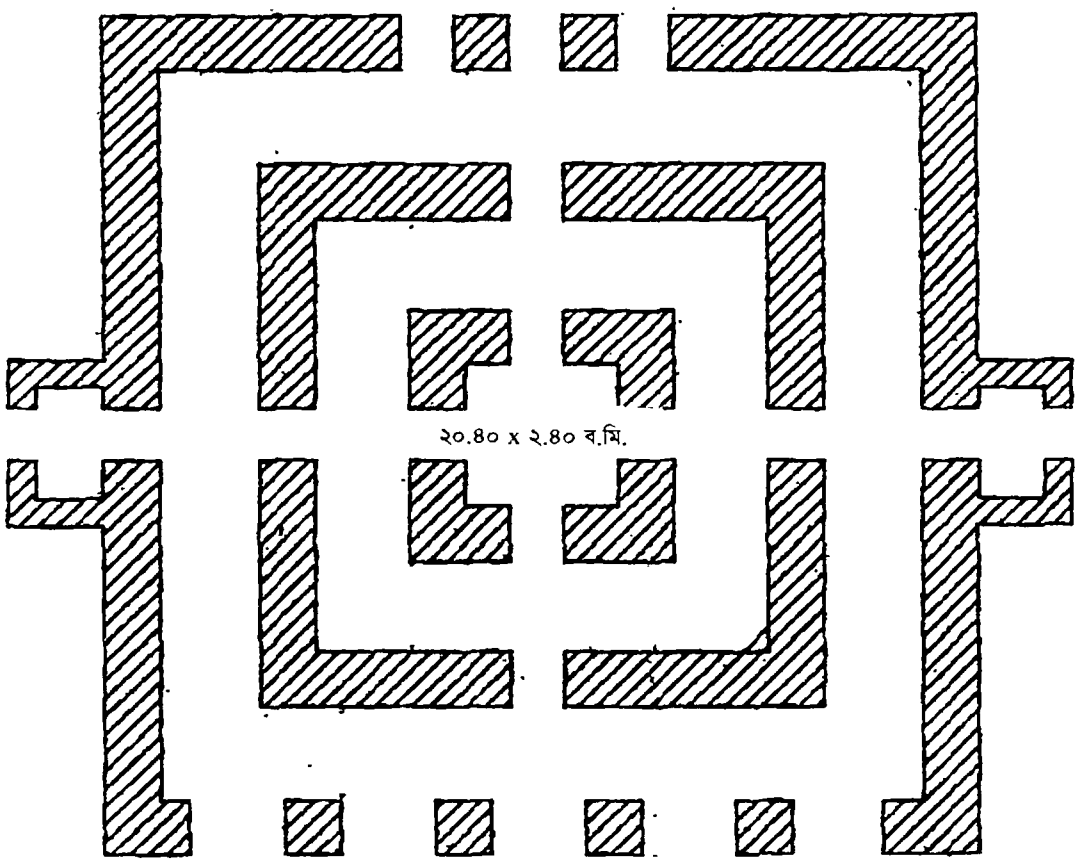

ভূমি নকশা : ৮. রশিক রায়ের মন্দির

Dhaka University Institutional Repository

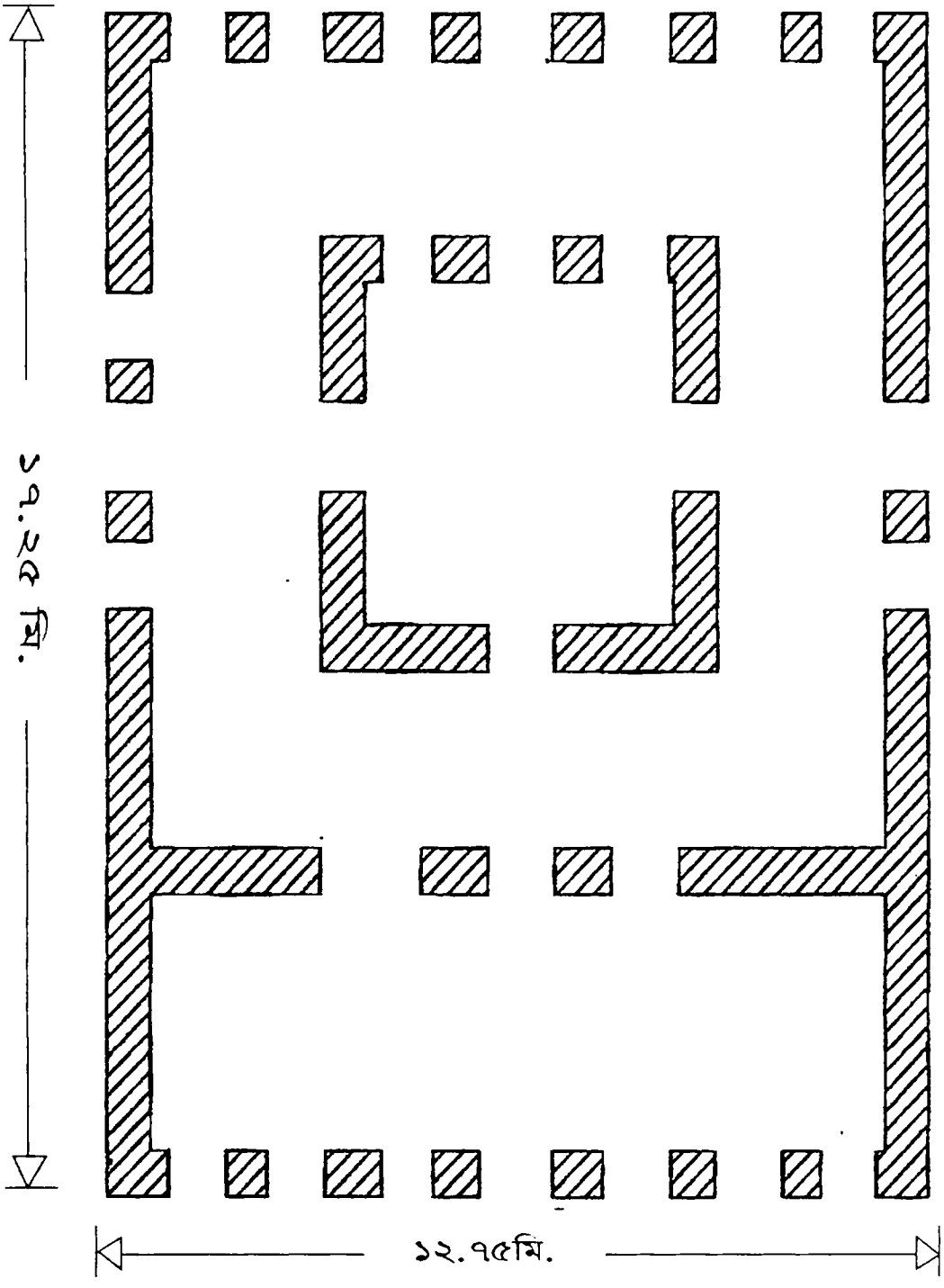

ভূমি নকশা : ৯. তাড়াশ গোবিন্দ মন্দির (নাটমন্দির)

Dhaka University Institutional Repository

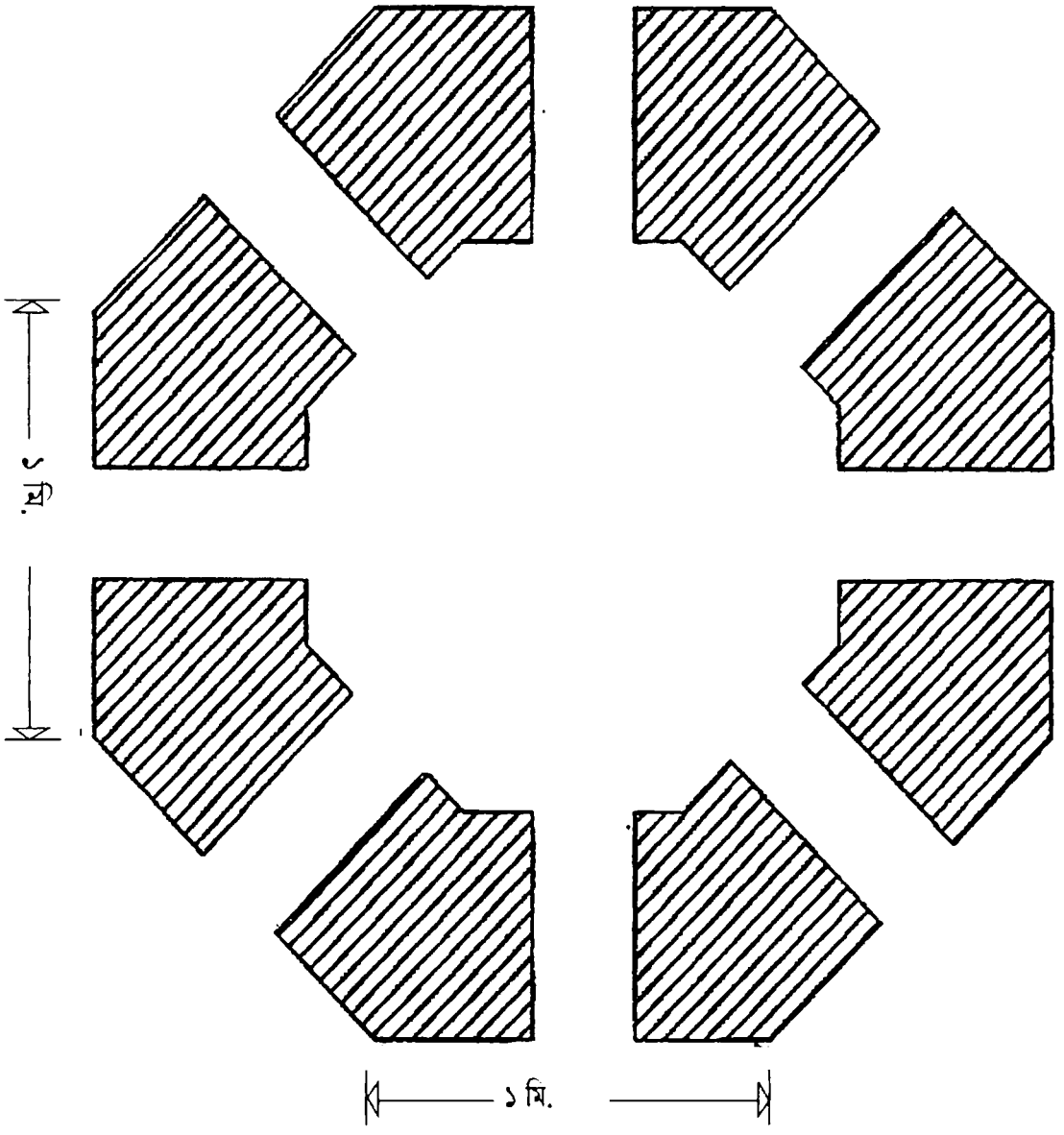

ভূমি নকশা : ১০. ছোট শিব মন্দির (জগন্নাথ মন্দির)

Dhaka University Institutional Repository

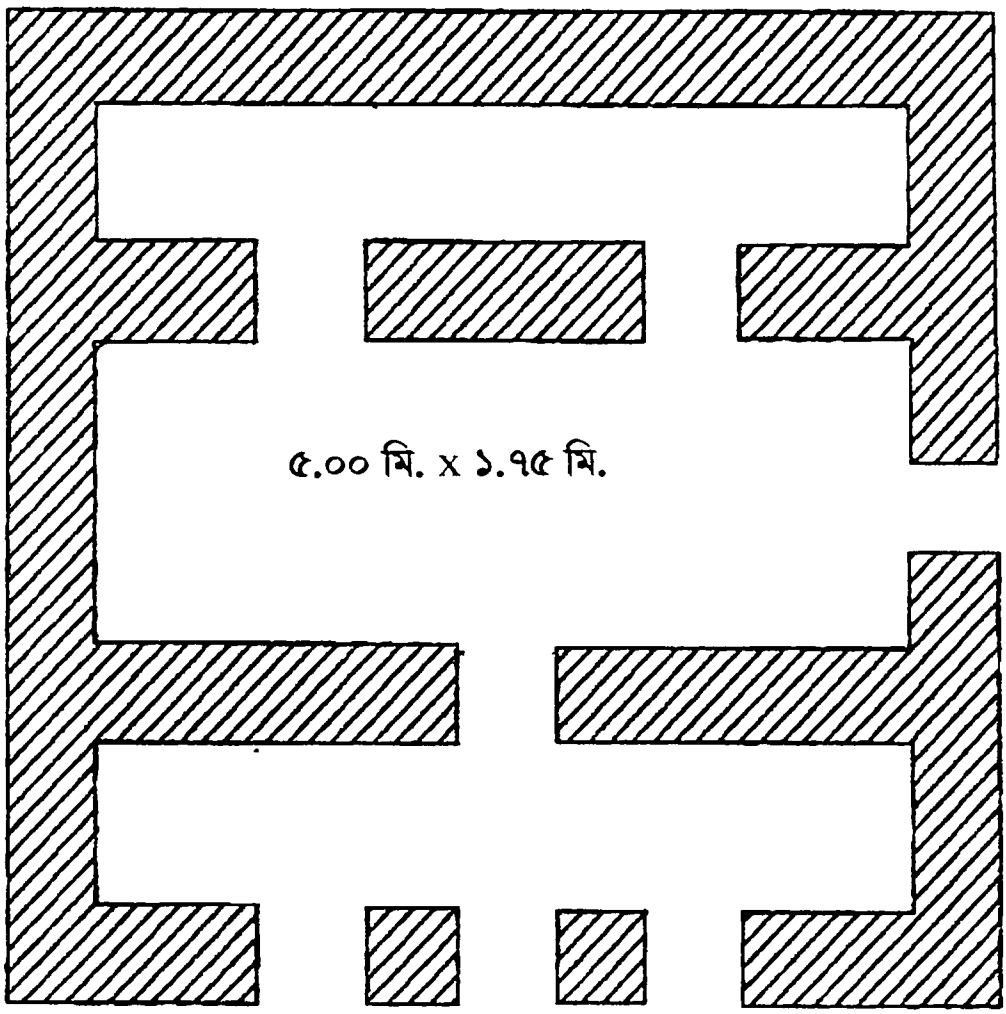

ভূমি নকশা : ১১. বৃন্দাবন বিহারী মন্দির

Dhaka University Institutional Repository

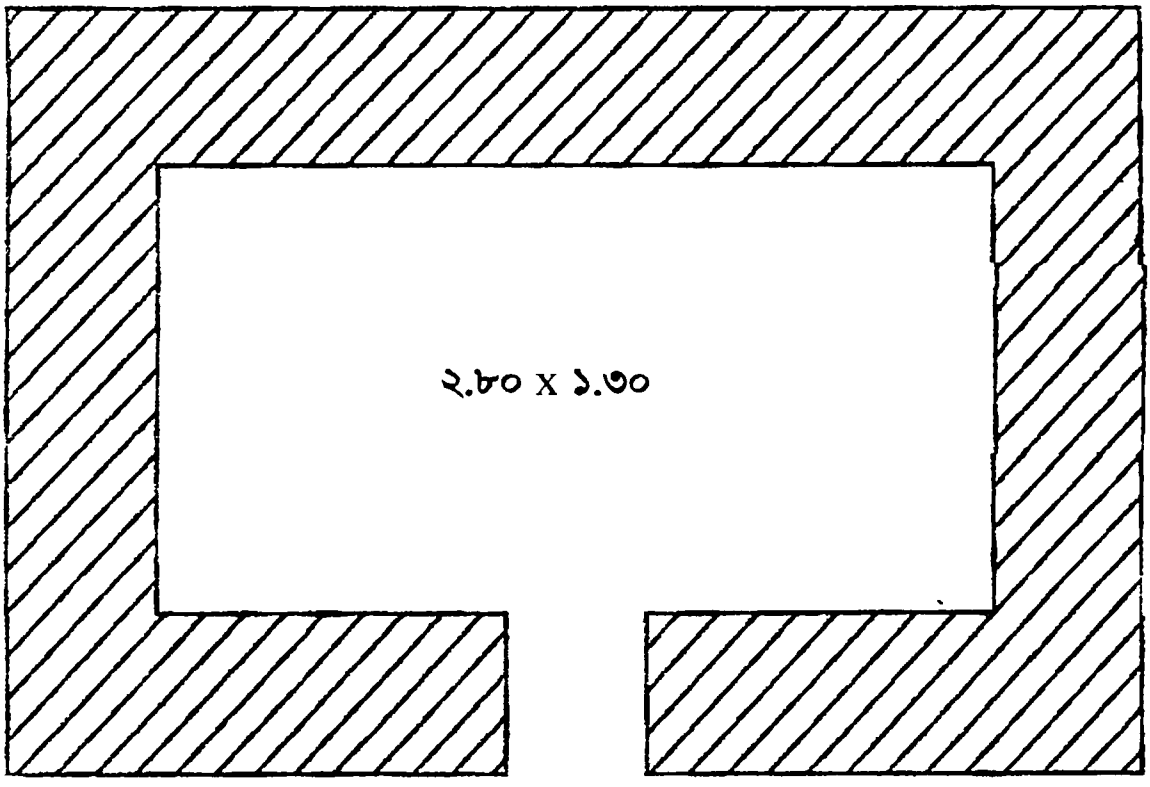

ভূমি নকশা : ১২. বারুহাস ইমামবাড়া-১

Dhaka University Institutional Repository

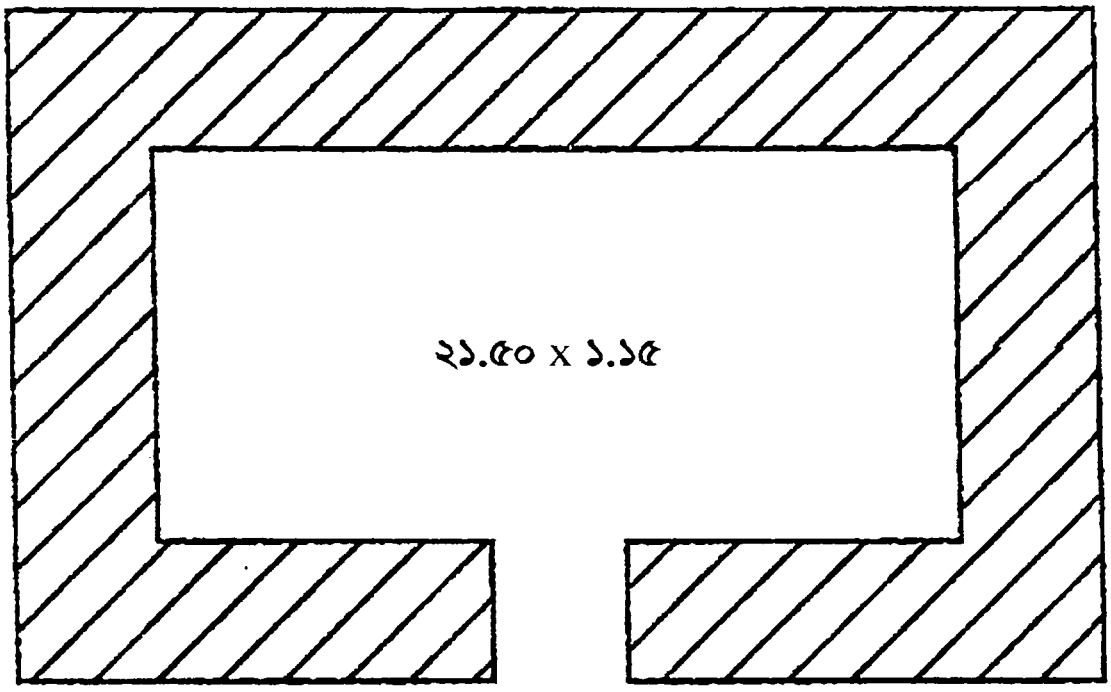

ভূমি নকশা : ১৩. বারুহাস ইমামবাড়া-২

Dhaka University Institutional Repository

আলোকচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১: পাহিল এর শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২: মাধাই নগর তাম্রশাসন।

Dhaka University Institutional Repository

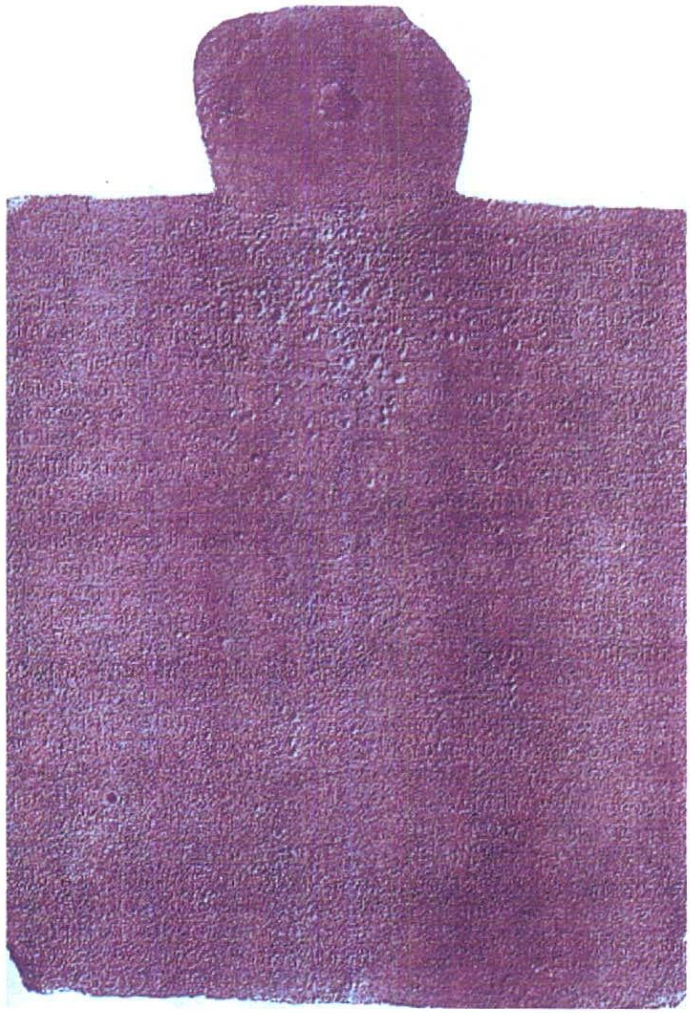

চিত্র ৩: মাধাই নগর তাম্রশাসন।

Dhaka University Institutional Repository

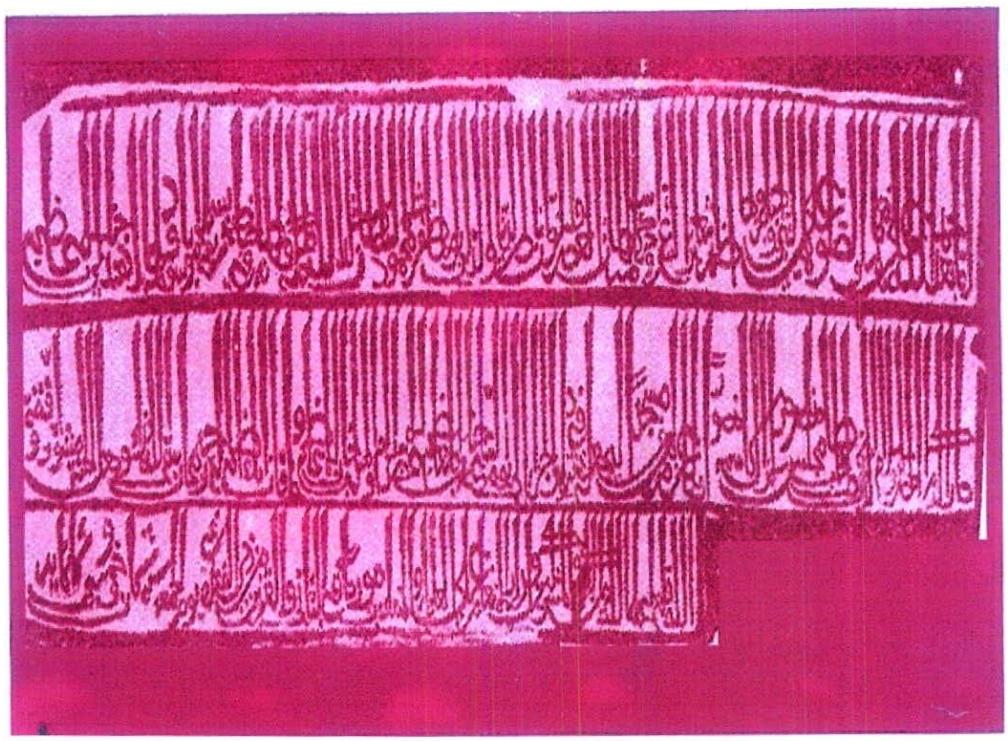

চিত্র ৪: নবগ্রাম ভাগনের মসজিদের শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৫: নবগ্রাম ভাগনের মসজিদের মিহরাব

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৬: নবগ্রাম ভাগনের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৭: নবগ্রাম ভাগনের মসজিদের অলংকৃত প্রস্তর স্তম্ভ

Dhaka University Institutional Repository

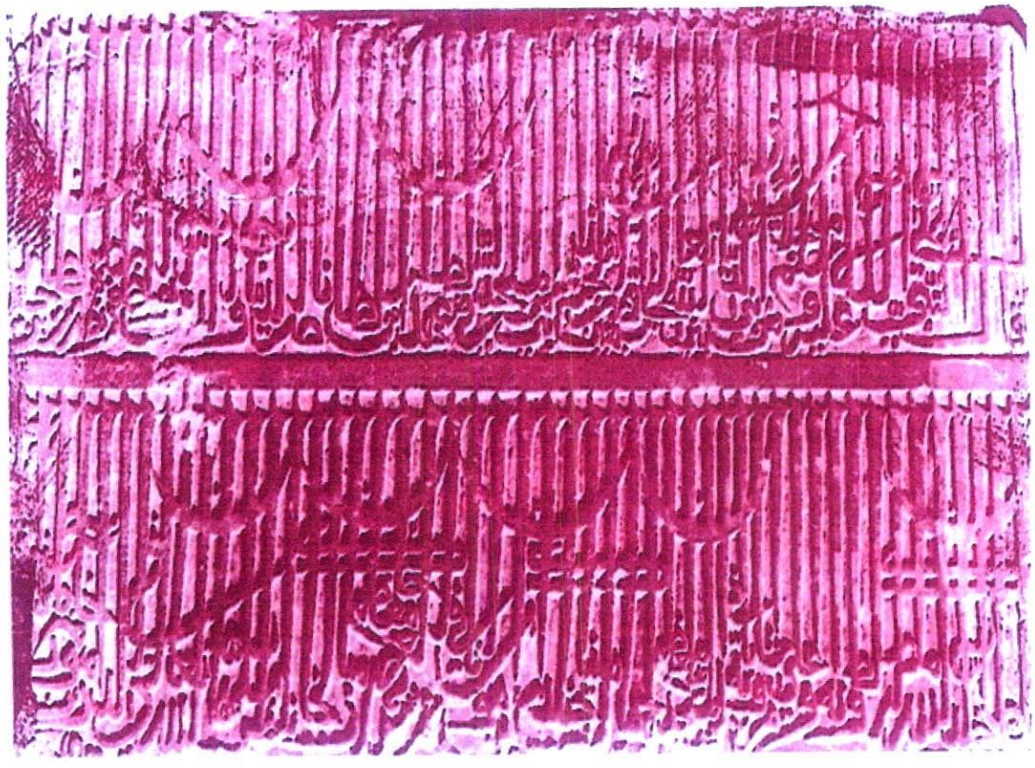

চিত্র ৮: নবগ্রাম শাহী মসজিদের শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৯: নবগ্রাম শাহী মসজিদ, চার গম্বুজ বিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১০: নবগ্রাম শাহী মসজিদের পিছনের অংশ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১১: নবগ্রাম শাহী মসজিদের সম্মুখ বারান্দায় কষ্টি পাথরের স্তম্ভ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১২: বারুহাস মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৩: গদাই সরকারের মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৪: ইসলামপুর জামে মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

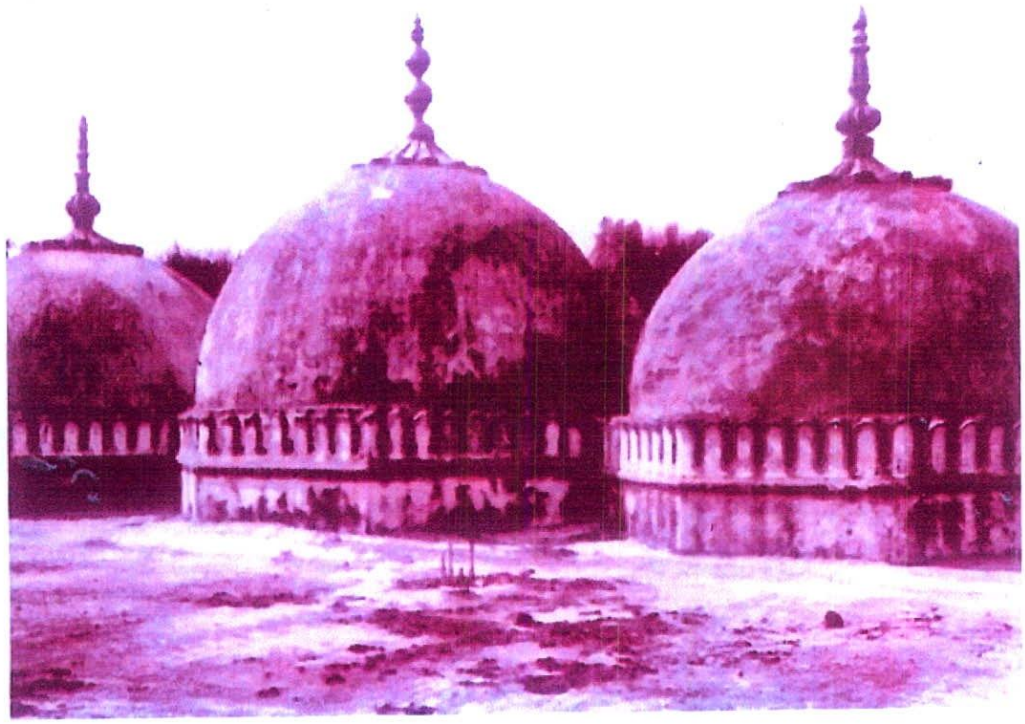

চিত্র ১৫: সান্দুরিয়া জামে মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৬: হযরত শাহ্ শরীফ জিন্দানীর মাজার

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৭: তাড়াশ শিব মন্দিরের প্রবেশ পথ (দক্ষিণমূখী)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৮:তাড়াশ শিব মন্দিরের অলংকৃত সম্মুখ ফাসাদ (দক্ষিণমুখী)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ১৯: তাড়াশ শিব মন্দিরের শিলালিপি (দক্ষিনমুখী)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২০: তাড়াশ শিব মন্দির (পশ্চিমমুখী)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২১: রসিক রায়ের মন্দির

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২২:রসিক রায়ের মন্দিরের দোচালা প্রবেশপথ।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৩:তাড়াশ গোবিন্দ মন্দির

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৪:ছোট শিব মন্দির (জগন্নাথ)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৫:ছোট শিব মন্দিরের মধ্যে স্থাপিত শিব লিঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৬:বৃন্দাবন বিহারী মন্দির

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৭:গোপাল বাড়ি মন্দির

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৮:কাঁটার বাড়ি মন্দির (পুনর্নির্মিত)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ২৯:নওগাঁ শিবমন্দির

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩০:বেহুলার কূপ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩১: বেহুলার ভিটা

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩২:বারুহাস ইমামবাড়া-১

Dhaka University Institutional Repository

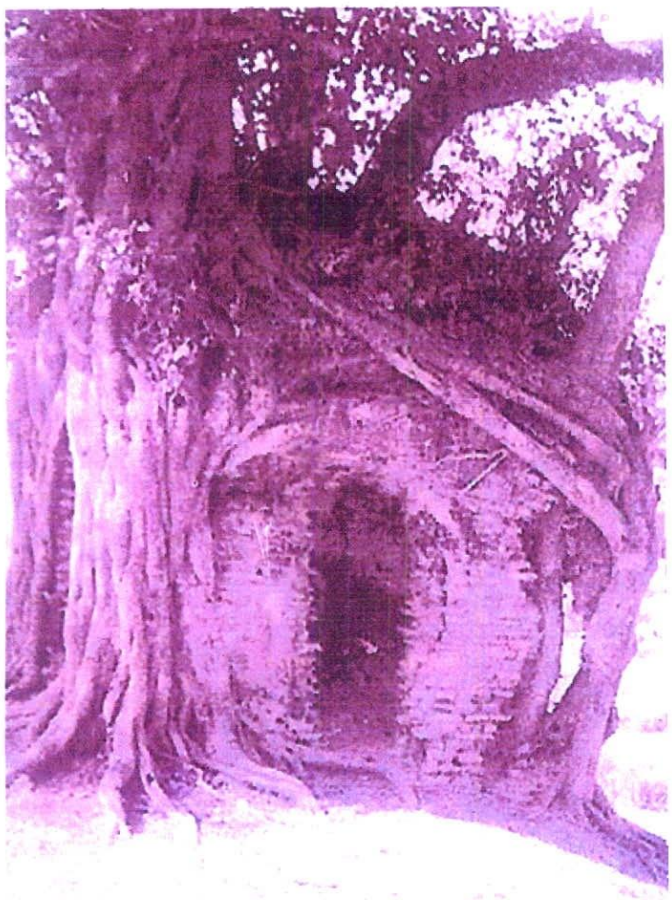

চিত্র ৩৩:বারুহাস ইমামবাড়া-২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৪:বস্তুল শিববাড়ি

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৫:বিবির বাংলা (পুনর্নির্মিত)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৬:তাড়াশ রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৭:রংমহল

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৩৮:ভান সিংহের দীঘি

Dhaka University Institutional Repository

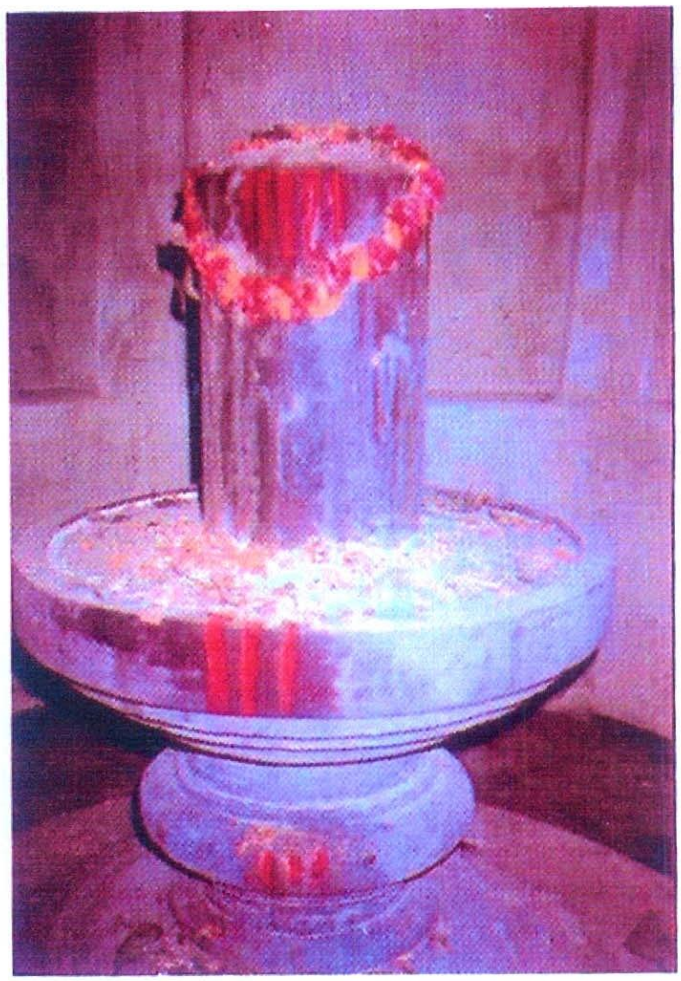

চিত্র ৩৯:নওগাঁ শিব লিঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪০:রাণীর জাঙ্গালের সেতু

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র ৪১:রাণীর জাঙ্গালের সেতুর শিলালিপি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ১

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপত্য পরিভাষা

আইল (aisle) - দুই সারি স্তম্ভ দ্বারা পৃথক করা মধ্যবর্তী অংশ বা পথ।

আর্চ (arch) - খিলান, কোন উন্মুক্ত স্থানকে পার্শ্ববর্তী দুটি স্তম্ভ বা দেয়ালের সাথে সংযোগ সাধনের উদ্দ্যেশ্যে উন্মুক্ত স্থানের উপর বক্রাকার বা এরূপ কোন আকারের স্থাপত্য কৌশল এমনভাবে নির্মিত হয় যে তার উপরস্থ চাপ কর্ণের রেখায় নিচের দেয়ালে বা স্তম্ভের উপর পড়ে। সাধারণত দরজা ও জানালার উপর নির্মিত এইরূপ স্থাপত্য অঙ্গকে খিলান বলে।

ইনসক্রিপশন (inscription) - শিলালিখন

এনগেজড কলাম (engaged column) -সংলগ্ন-স্তম্ভ

এপেক্স (apex) - শীর্ষ, চূড়া

এক্সিস (axis) - অক্ষ

কনস্ট্রাকশন (construction) - গঠণ, নির্মাণ

কার্ভেলিনিয়ার (curvilinear) - বাঁকানো ছাদ, বক্র ছাদ

করবেল পদ্ধতি (corbel system) - ক্রমপূরণ পদ্ধতি

কলাম (column) - স্তম্ভ

Dhaka University Institutional Repository

কনকেভ (concave) - অবতল

কনভেক্স (convex) - উত্তল

কিউপলা (cupola) - ক্ষুদ্র গম্বুজ

কিয়স্ক (Kiosk) - ছত্রী

কর্ণিশ (cornice) - কার্ণিশ

কোর্ট (court) - অঙ্গন, প্রাঙ্গণ

ক্রাউন (crown) - খিলান শীর্ষ

কার্ভিং(carving) - খোদাই কাজ

ক্যাপিটাল (capital) - স্তম্ভ শীর্ষ

ক্যাস্প (cusp) - খাঁজ

টেরাকোটা (terracotta) - পোড়ামাটির চিত্র ফলক

ট্রান্সভার্স (transverse) - আড়াআড়ি

টাওয়ার (tower) - বুরুজ, মিনার , স্তম্ভ

টিম্পেনাম (tympanum) - খিলান-পটহ

ড্রাম (drum) - স্কন্ধ

ডোম (dome) -গম্বুজ, কোন কক্ষ বা ইমারতের উপর নির্মিত অর্ধবৃত্তাকার বা এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট ছাদকে গম্বুজ বলে।

Dhaka University Institutional Repository

মোটিফ (motif) - নকশার মূল বিষয়

মোল্ডিং (moulding) - ছাঁচ

রোজেট (rosette) - চক্রাকার ফুলের নকশা

স্কুইঞ্চ (squinch) - গম্বুজ নির্মানের ক্ষেত্রে বর্গ থেকে বৃত্তে পৌছাবার লক্ষ্যে বর্গের কোনায় নির্মিত খিলান ভিত্তিক স্থাপত্যিক গঠন

স্ট্যাকো (stucco) - প্রাচীর গাত্রে পলেস্তরার সৃষ্ট অলংকরণ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : ২

Dhaka University Institutional Repository

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত তাড়াশ অঞ্চলের প্রত্ন নিদর্শন

১. বিষ্ণু মূর্তি সংবলিত ভিত

খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক

উপাদান : কালো ব্যাসাল্ট পাথর, ৫৮.৪ সে.মি. × ২৭.৯ সে.মি.

প্রাপ্তিস্থান : তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

দাতা : যতীন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংযোজন নম্বর : ৩৬৭৬

২. গড়ুর মূর্তি

খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক

উপাদান : কালো ব্যাসাল্ট পাথর; উচ্চতা : ৭৮.৭ সে.মি.

প্রাপ্তিস্থান : তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

দাতা : যতীন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংযোজন নম্বর : ৩৬৭৭

৩. মুখ লিঙ্গ

খ্রিষ্টীয় দশম শতক

উপাদান : ধূসর বেলে পাথর; উচ্চতা : ১৯ সে.মি.

প্রাপ্তিস্থান : নবগ্রাম, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

দাতা : এ সাত্তার

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংযোজন নম্বর : ৩১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৪. দুর্গা মহিষ মর্দিনী

খ্রিষ্টীয় একাদশ শতক

উপাদান : কালো কষ্টি পাথর; ৪৩.২ সে.মি. × ২১.৬ সে.মি.

প্রাপ্তিস্থান : তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

দাতা : সুবাস চন্দ্র গোস্বামী

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংযোজন নম্বর : ৩৬৭২

৫. সূর্য

খ্রিষ্টীয় দশম-একাদশ শতক

উপাদান : কালো কষ্টি পাথর; ১২৯ সে.মি. × ৬৩ সে.মি.

প্রাপ্তিস্থান : তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

দাতা :.ডেপুটি কমিশনার পাবনা ও সাব-ডিভিশনাল অফিসার, সিরাজগঞ্জ

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংযোজন নম্বর : ৩৮০৫, প্লট নম্বর : ২৪৮

৬. একটি অনিশ্চিত বিগ্রহের ভিত

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতক

উপাদান : কালো কষ্টি পাথর; ৮৯ সে.মি. × ২৫.৪ সে.মি.

প্রাপ্তিস্থান : নবগ্রাম, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

দাতা : দৌলতুন নেছা খন্দকার

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংযোজন নম্বর : ৩১৭১

Dhaka University Institutional Repository

৭. মূর্তি পেছনের উপরিভাগ

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতক

উপাদান : স্লেট : ৪০ সে.মি. × ৫৭ সে.মি.

প্রাপ্তিস্থান : তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

দাতা : যতীন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংযোজন নম্বর : ৪২৩৮

৮. স্তম্ভের অংশ

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতক

উপাদান : ধূসর বেলে পাথর; উচ্চতা : ৫০.৮ সে.মি.

প্রাপ্তিস্থান : নবগ্রাম, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

জাদুঘর কর্তৃক ক্রয়কৃত,

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংযোজন নম্বর : ৩১৬৫

৯. বন্ধনীর অংশ

খ্রিষ্টীয় দশক শতক

উপাদান : ধূসর বেলে পাথর; ৫৮.৭ সে.মি. × ১৭ সে.মি. × ২০.৮ সে.মি.

প্রাপ্তিস্থান : নবগ্রাম, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

জাদুঘর কর্তৃক ক্রয়কৃত,

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংযোজন নম্বর : ৩১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

১০. কার্নিশ

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতক

উপাদান : ধূসর বেলে পাথর; ৪৭ সে.মি. × ৩৮ সে.মি. × ১১.৫ সে.মি

প্রাপ্তিস্থান : নবগ্রাম, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

জাদুঘর কর্তৃক ক্রয়কৃত,

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংযোজন নম্বর : ৩১৬৭

১১. অলংকৃত কার্নিশ

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতক

উপাদান : ধূসর বেলে পাথর; ৫৫.৮ সে.মি. × ৩৪ সে.মি. × ১২ সে.মি

প্রাপ্তিস্থান : নবগ্রাম, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ (পাবনা)

জাদুঘর কর্তৃক ক্রয়কৃত,

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর সংযোজন নম্বর : ৩১৬৮ ; প্লট নম্বর : ৩৯৬

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলাগ্রন্থ

আনিসুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খন্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

আলী,এ,কে,এম, ইয়াকুব, *মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।

আবু তালিব, মুহম্মদ, *পাবনা জেলায়* ইসলাম, ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ, ১৯৯০।

করিম, আব্দুল, বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আলম, ঢাকা: জাতীয়গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯।

করিম, আব্দুল, *বাংলার ইতিহাস,* মুঘল আমল, রাজশাহী: আই.বি.এস. ১৯৯২।

খালেকুজ্জামান, মো., (সম্পা.) বৃহত্তর *পাবনা জেলা প্রত্নতাত্ত্বিক* জরিপ প্রতিবেদন, ঢাকা, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭।

চক্রবর্ত্তী, রতনলাল *বাংলাদেশের মন্দির*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

চক্রবর্ত্তী, নরেশচন্দ্র *শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯১

চৌধুরী, মহাম্মদ বদরুদ্দোজা *জিলা পাবনার ইতিহাস,* পাবনা, লেখক স্বয়ং, ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী, সাইফুদ্দিন ও অন্যান্য (সম্পা.),*বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, রাজশাহী, গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি, ১৯৯৮।

জাহেদী, মনোয়ার হোসেন (সম্পা.), *শতবর্ষ স্মরণিকা, ১৯৯০ "পাবনা অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী"*, *পাবনা*, ১৯৯০।

তরফদার, ম.র., *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫।

বসু, অমিয়, *বাংলায় ভ্রমন*, ১ম ও ২য় খন্ড, কলিকাতা : পূর্ব বঙ্গ রেলপথ, ১৯৪০।

বেগম, আয়শা, *আমাদের ঐতিহ্য শাহজাদপুর মসজিদ*, ঢাকা, শিল্প কলা একাডেমী, ১৯৯০।

---------, *পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা-২০০২।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়, *বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা, ভারতী বুকষ্টল, ১৯৯৮।

যাকারিয়া, আ ক মো, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, ঢাকা, শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪।

রহমান, সুফী মোস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-১, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,০৭

রহিম, এম,এ, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, কলকাতা : ২য় সংস্করণ ১৪০২, প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬।

শাহনাওয়াজ এ.কে.এম., *মুদ্রায় ও শিলালিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

হোসেন, এ.বি.এম.(সম্পা.), *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-২, স্থাপত্য*, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,০৭

সাহা, রাধারমন, *পাবনার ইতিহাস* ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড, পাবনা: লেখক স্বয়ং, ১৩৩০-১৩৩৩ বাং

হারুন অর রশিদ, *নওগাঁর ইতিকথা, সিরাজগঞ্জ*, রশিদুন্নেসা, ১৩৯১ বাং

হামিদ, আবদুল, *চলনবিলের ইতিকথা*, পাবনা, আমাদের দেশ প্রকাশনী, ১৯৬৭।

হক, এনামুল, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম*, ঢাকা, আদিল ব্রাদার্স, ১৯৪৮।

হাসান, সৈয়দ মাহমুদুল, *বাংলাদেশের মসজিদ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।

হুসাইন, রবিউল, *বাংলাদেশের স্থাপত্য সংস্কৃতি*, ঢাকা, সাহিত্য সমবায়, ১৯৮৭।

বাংলা প্রবন্ধ

আলী,এ, কে, এম, ইয়াকুব, "নবগ্রাম শিলালিপি" *ইতিহাস*,একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবন-চৈত্র, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ ১৩৮৪।

Dhaka University Institutional Repository

খাতুন, আশীয়ারা, "সুলতানি আমলে বাংলার নগর : প্রকৃতি ও প্রকার ভেদ" *ইতিহাস*, ত্রিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৪০৩।

খান, মুহম্মদ হাফিজ উল্লাহ, "বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে পোড়ামাটির অলংকরণ," *ইতিহাস*, চতুর্দশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ঢাকা ইতিহাস পরিষদ, ১৩৮৭।

খাতুন, হাবিবা, মুহাম্মদাবাদঃ স্থান চিহ্নিতকরণ প্রসঙ্গ, *ইতিহাস*, পঞ্চদশ- বিংশবষ সম্মিলিত সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, ১৩৮৮-১৩৯৩।

তরফদার, মমতাজুর রহমান, ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের অলংকরণ প্রসঙ্গে, *ইতিহাস*, একবিংশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-অগ্রহায়ণ, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, ১৩৯৪।

বেগম, আয়শা, 'চাটমোহরের শাহী মসজিদ : বাংলা স্থাপত্যশিল্পে যুগ সন্ধিলগ্নের নির্দশন', *শিল্পকলা*, ঢাকা, শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯২।

----------, "পাবনার জোড়-বাংলা মন্দির", ঢাকা, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ১৫শ খন্ড, জুন, ১৯৯৭।

----------, "শাহজাদপুরের স্থাপতিক ঐতিহ্য", *প্রত্নতত্ত্ব*,

Dhaka University Institutional Repository

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭।

----------, "হাটিকুমরুলের মন্দির ও স্থাপত্য :একটি সমীক্ষা", *প্রবন্ধ সংকলন*, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

----------, "বাংলার মধ্যযুগীয় স্থাপত্য নবগ্রাম", *নিবন্ধমালা*, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, ১৯৯৯ ।

হোসেন,এ, বি, এম, "সুলতানী বাংলার স্থাপত্য শিল্প একটি পর্যালোচনা", *ইতিহাস*, দশম বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, ১৩৮৩।

রহমান, মকসুদুর, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া ও রাণী ভবানীর রাজ্য নাশঃ একটি সমীক্ষা", *ইতিহাস*, একবিংশ বর্ষ, প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-অগ্রহায়ন, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, ১৩৯৪।

মু মনসুর উদ্দীন ও রইস উদ্দীন আহমদ, "নবগ্রাম মসজিদের ইতিহাস", *মাসিক মোহাম্মদী*, ঢাকা, ১৩৩৬ (বাংলা)।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস, স্বপন কুমার, "পালরাজ দেবপালের সমসাময়িক শ্রী পাহিলের একটি অপ্রকাশিত প্রস্তর লিপি, *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রত্রিকা*, দ্বাদশখন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর, ১৯৯৪/১৪০১।

শাহ নাওয়াজ, এ, কে, এম, "শিলালিপির সাক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ অন্বেষণ: সুলতানী বাংলা," *ইতিহাস*, ত্রিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ১৪০৩।

English Books

Abul Fazal, *Eng, Tran. H. Beveridge, Akbarnama,* 3 vols, Delhi, Indian Reprint, 1972-73

Ahmed, Nazimuddin, *Discover The Monuments of Bangladesh.* Dhaka : UPL, 1984

Ahmed, Nazimuddin, *Epic Stories in Terracotta,* Dhaka : UPL, 1990

Dhaka University Institutional Repository

Ahmed, Abu Sayeed Mostaque, *The Chota Shona Mosque in Gour.* Germany : University of karlsouhe, 1997

Ahmed Babu and Nazly Chowdhury, *Selected Hindu Temples of Bangladesh,* Dhaka, Unesco, 2005.

Ahmed, Shamshuddin, *Inscriptions of Bengal,* Vol. iv, Rajshahi: VRM, 1960.

Ahmed Sultan, *Archaeological Survey in the Northern Districts of Bangladesh :* Unprotected Site and Monument. Rajshahi : Rajshahi University, 1999 (Unpublished)

Ali, AKM Yakub, *Aspects of Society and Culture of the Varendra* 1200-1576 AD. Rajshahi : M. Sajjadur Rahman, 1998.

Blockman, H, *Eng. Tran, Ain-i-Akbari.* Vol. 1, 2nd ed, *Revised by D.C. Phillot, Biblitheka Indica,* Calcutta, 1939.

Dhaka University Institutional Repository

Bari, M,A, *Mughal Mosque- Style in Bangladesh : A study of Origin and Development.* Rajshahi : IBS, 1989, (Unpublished)

Chakravarti, Dilip Kumar, *Ancient Bangladesh,* Dhaka : UPL, 1992

Dani, A,H., *Muslim Architecture in Bengal,* Dacca : Asiatic Society of Pakistan, 1961.

Chowdhuary, Nazly and Babu Ahmed, *Mughal Monuments of Bangladesh,* Dhaka, Traditional Photo Gallery,06

Dept. of Archaeology (GOB), *Relevant Reports Past and Present.*

Hasan, Perween, *Sultans and Mosques : The Early Muslim Architecture of Bangladesh,* London and New York : I.B. Tauris, 2007

Haque, Enamul, *The Art Herittage of Bangladesh*, Dhaka. ICS BA, 2007.

Haque, Enamul, *Islamic Art Heritage of Bangladesh,* Dhaka : BNM, 1983

Dhaka University Institutional Repository

Haque, Saif ul And Others (ed.), *Pundranagar to Sherebanglanager : Architecture in Bangladesh,* Dhaka : Chetona Sthapatya Unnoyon Society, 1997.

Husain, A,B,M, (ed), *Gaur-Lakhnauti,* Dhaka : ASB, 1997

Husain, A,B,M, (ed.), *Sonargaon- Panam,* Dhaka, ASB, 1997

Hunter, W,W, *A Statistical Account of Bengal* Relevant vols.

Islam, sirajul (ed.), *History of Bangladesh, vols. 1-3* Dhaka : ASB, 1998.

Karim, Abdul, *Social History of the Muslims in Bengal,* Dacca: ASP, 1957

Karim, Abdul, *History of Bengal : Mughal Period,* vol. ii, Rajshahi, IBS, 1995

Karim, Abdul, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal,* Dhaka : ASB, 1992

Dhaka University Institutional Repository

Khan, Abid, Ali, *History and Archaeology of Bengal,* edited by H.E. Stapletion, New Delhi: Asian Publication Service, 1980.

Khan, M,H, *Terracotta Ornamentation's of Muslim Architecture in Bengal,* Dhaka : ASB, 1988.

Khan, N,I, (ed.), *Bangladesh District Gezetteer Pabna,* Dacca : Govt. Press, 1978.

List of Ancient Monuments in Bengal, Calcutta: Public works Dept. Govt. of Bengal, 1896

List of Protected Monuments and Mounds, Dhaka : Dept of Archaeology, GOB, 1977.

Minhaj us Siraj, *Tabakat-i-Nasiri, 2* Vol, New Delhi: Oriental Book, Reprint, 1970

Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghayibi, (M.I. Bora Tran.)* 2 vols. Gauhati : Govt. of Assam, 1936

Dhaka University Institutional Repository

Mc Cutchion, David J, *Late Medieval Temples of Bengal*, Calcutta : The Asiatic Society, 1972.

Michell George, *Brick Temples of Bengla*, Princeton : University Press, 1983

Michell, George (ed), *Brick Temples of Bengal, Paris;* UNESCO, 1984

Majumdar, R.C., *The History of Ancient Bengal*, Calcutta G.Bharadhaj, 1974.

O' Malley. L.S.S, *Bengal District Gezetteers Pabna*, Calcutta : Bengal Secretariet Book Depot. 1923.

Salim Allah, *Eng. Tran. F. Gladwin, Tawarikh-i-Bangladesh*, Calcutta : The Asiatic Society, 1998

Saraswati, S.K., *Architecture of Bengal, Book 1*, Calcutta :G. Bharadwaj and Co, 1976

Tarfder, M.R, *Husainshahi Bengal*, Dhaka : University of Dhaka, 1999.

Dhaka University Institutional Repository

Wali, M,A., *On the Entiquity and Tradition of Shahzadpur" JASB,* Vol. LXIII, Part 1, Calcutta : The Asiatic Society, 1904.

Zahiruddin and others, *Contemporary Architecture of Bangladesh,* Dhaka : Inst. Of Architectures of Bangladesh, 1990.

Asher, B, Catherine, *Architecture of Mughal India,* Cambridge University Press, 1992.

Dani, A,H, *Proceedings of the Pakistan History Conference,* 1953, 3rd session, Dhaka.

Majumder, N,G (ed), *Inscription of Bengal,* Voll-3, Rajshahi.

Short papers

Bharttacharya, G, 'Bangladesh National Museum Prasasti of Pahila (9th Contany)', *Journal of Bengal Art. Voll-3* Dhaka, ICSBA, 1997

Chakravarti , M, 'Bengali Temples and their General Characteristic', *Journal & Proceedings of the ASB,* New series Vol. V, Calcutta, 1909.

Dhaka University Institutional Repository

Hasan, Perween, 'Sultanate to Mughal: An Architecture of Transition in Bengal,' *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. 33, No.2' December 1988.

----------, 'Reflection on Early Temples form of Eastern India,' *Journal of Bengal Art*, Vol-2, Dhaka, ICSBA, 1997.

Hasan, Syed Mahmudul, 'Sultani Architecture of Bengal: Analysis of Source- Materials and observations (1745-1987)', *JASB*, Vol-33, No, 2, December 1988.

Michell,George, 'The Revival of Temple Architecture in Bengal in the Late sixteenth-century', *Journal of Bengal Art*, Vol.2,Dhaka, ICSBA 1997.